প্যারাসাইকোলজি উপন্যাস

বৃষ্টি ভেজা জোছনা

প্রথম ফ্লাপঃ

নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমানের একমাত্র সন্তান অনিক। বয়স আট বছর, ক্লাস টু এর ছাত্র। একদিন রাতে হঠাৎই অনিক বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। অনেক খুঁজে তাকে পাওয়া গেল বাড়ির বাগানের মধ্যে। জোছনা রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে চাঁদ দেখছে আর কার সাথে যেন কথা বলছে। অথচ আশেপাশে কেউ নেই। কার সাথে কথা বলছে জানতে চাইলে অনিক জানাল, সে তার মায়ের সাথে কথা বলছে। শিখা রহমান এবং নাজমুল হাসান বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। এখানেই শেষ নয়। সময়ের সাথে সাথে অনিকের আচরণে ভয়ংকর সব পরিবর্তন আসতে লাগল। এক পর্যায়ে সে জানাল তার বাবা মৃত এবং তার মা অসুস্থ। মাঝে মাঝে তার মা তার কাছে আসে এবং কথা বলে। সুযোগ পেলে সে তার মায়ের কাছে চলে যাবে। কথাগুলো শোনার পর শিখা রহমানের শয্যাশায়ী হওয়ার মতো অবস্থা। কী বলছে অনিক! যে অনিককে তিনি নিজে পেটে ধরেছেন সেই অনিক কিনা বলছে তার মা অন্য একজন! সমস্যার সমাধানে নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান এলেন মনোচিকিৎসক ডাক্তার তরফদারের কাছে। সবকিছু শোনার পর ডাক্তার তরফদার অনিকের অদৃশ্য মাকে খুঁজে বের করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু এত সহজ নয় অদৃশ্য একজন মানুষকে খুঁজে বের করা!

শেষ পর্যন্ত ডাক্তার তরফদার কী পেরেছিলেন অনিকের রহস্যময়ী অদৃশ্য মাকে খুঁজে বের করতে?

লেখকের কথা

২০১৩ সালের ৪ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করি। ট্যাক্সিতে যখন হোটেলে যাচ্ছিলাম তখন বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি হলে সাধারণত চারদিকটা অন্ধকার হয়ে যায়। অথচ ঐ সময় চারপাশটা অন্ধকার ছিল না, ছিল আলোকিত। আলোর তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বৃষ্টির ফোটাগুলো স্পষ্ট দেখা যচ্ছিল। সাধারণ স্ট্রিট ল্যাম্পে আলোর তীব্রতা অতটা হওয়ার কথা নয়। এজন্য আমি আলোর উৎস নিয়ে ভাবছিলাম। হঠাৎ ভাবলাম আকাশে চাঁদ আছে কিনা দেখি। চাঁদ থাকলে জোছনা থাকবে, জোছনা থাকলে আলোর উজ্জ্বলতা বাড়বে। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে তাকিয়ে চাঁদটা দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না। হয়তো চাঁদ আমার জানালার উলটো পাশে ছিল। আদৌ চাঁদ ছিল কি না জানি না? আরও জানি না, জোছনা রাতে কখনও বৃষ্টি হয় কিনা। হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। হলে আবার সেই বৃষ্টিতে জোছনা ভিজে কিনা সেটাও জানি না। যদি না ভিজে তাতেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ বইটি প্যারাসাইকোলজি। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে যে ঘটানাগুলো ঘটার কথা নয় অথচ ঘটে, সেগুলোই প্যারাসাইকোলজি। কাজেই জোছনা রাতে বৃষ্টি না হলেও কিংবা বৃষ্টিতে জোছনা না ভিজলেও উপন্যাসটির নাম 'বৃষ্টি ভেজা জোছনা' ঠিকই আছে। সিঙ্গাপুরে ট্যাক্সিতে বসে ঐ দিন সকালেই 'বৃষ্টি ভেজা জোছনা' নামে একটি উপন্যাস লিখব বলে মনস্থির করি। কিন্তু সিঙ্গাপুরে আমার ল্যাপটপটি আমার সাথে ছিল না। তাই মানিব্যাগে রাখা ছোট্ট একটা কাগজে নামটা আর প্রথম লাইন 'প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে' লিখে রাখি। মূল উপন্যাসটিও ঐ প্রথম লাইন দিয়ে শুরু করি।

[ক্ষমা প্রার্থনাঃ করোনার কারণে এডিডেট এবং প্রুফ কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য মূল উপন্যাসে কিছু বানান ভুল বা বাক্যের অসঙ্গতি থাকতে পারে, সম্মানিত পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি]

উৎসর্গ

আমার লেখা প্রথম বই 'জকি' প্রকাশ হয় ২০০৪ সালের বইমেলায়। পুরো মেলায় তখন মাত্র একটি বই বিক্রি হয়েছিল। তাও কিনেছিল পরিচিত একজন। মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। এখন আর মন খারাপ হয় না। কারণ প্রতি বছর হাজার হাজার বই বিক্রি হয়। তবে একজনের মন খারাপ থাকে। সে হলো অসীম রায় শুভ। তার ধারণা আমার আরও অনেক অনেক বই পাঠকের হাতে পৌঁছান উচিত। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী শুভ সারাটা বছর নানাভাবে আমার বইগুলো পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করে। তার এই বিশ্বাস এবং প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আমার এই উৎসর্গ। শুভ, আপনার জীবন আরও সুখী, সুন্দর এবং আনন্দময় হোক। আপনি বেঁচে থাকুন শত বছরেরও অধিক।

মন্তব্য ২২ মে, ২০২০

[শুভ এখন আমেরিকায় থাকে। নিজের একটা গাড়ি আছে। স্ত্রীকে নিয়ে সুখেই আছে। মার্চ মাসে করোনা মহামারিতে তার চাকরি চলে গিয়েছিল। নতুন করে চাকরি পেয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্সও তার হয়ে গেছে। কিছুদিন পর হয়তো গ্রিন কার্ডও পাবে। মহান আল্লাহতালা বোধহয় আমার আবেদন মঞ্জুর করেছেন। শুভ এখন সুখী, দারুন সুখী।]

মূল উপন্যাস শুরু

১

প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে।

বৃষ্টির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে অনিক। বিছানায় শুয়ে থেকে একটানা সে কিছুক্ষণ বৃষ্টির শব্দ শুনল। তারপর তাকাল হাতের ঘড়ির দিকে। রুমের মধ্যে জিরো পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলাতে থাকায় ঘড়ির কাটা সে দেখতে পাচ্ছে। রাত তিনটা বাজে। এই সময়ে তার ঘুম ভাঙ্গার কথা নয়। অথচ ভেঙ্গেছে, কেন ভেঙ্গেছে সে অনুমান করতে পারছে। ইদানিং সে কিছু কিছু বিষয় অনুমান করতে পারে, উপলব্দি করতে পারে। তবে কেন পারে, কীভাবে পারে, তা সে জানে না।

অনিক এবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরের বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি দেখতে তার খুব ভালো লাগে। আজও লাগছে। আরও ভালোমতো দেখতে সে এবার বিছানা থেকে উঠল। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল জানালার কাছে।

অনিকদের বাড়ি ধানমন্ডিতে। দোতলা বিশাল আলীশান বাড়ি। বাড়ির সামনে এবং দক্ষিণ পাশে বড় বাগান। জানালা দিয়ে সেই বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বাগানের ঠিক মাঝে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মহিলা দৃষ্টি তার দিকেই। মহিলাকে দেখে অনিক উৎফুল্ল হয়ে উঠল। নিজের অজান্তেই তার ঠোঁটে একটা মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে উঠল।

বাগানে যে মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেও সে ভিজছে না। হালকা বাতাসে তার শাড়ীর আচল উড়ছে। তার চোখে মুখে একরকম তৃপ্তির হাসি থাকলেও তৃপ্তিটা যেন সম্পূর্ণ না। কোথায় যেন একটা কষ্টের ছাপ আছে। তবে তার সুন্দর মিষ্টি চেহারার কারণে কষ্টটা হাসিকে ছাপিয়ে উঠতে পারছে না।

অনিক আর মহিলার চোখাচোখি হতে মহিলা চোখ বন্ধ করে আবার চোখ খুলল। তারপর মুখের হাসি বিস্তৃত করে উলটো ঘুরে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে শুরু করল।

অনিক স্পষ্ট দেখতে পেল মহিলা বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। মুহূর্তেই সে অস্থির হয়ে উঠল। তারপর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে 'মা মা' বলে ডেকে উঠল।

মহিলাটি পিছন ফিরে তাকাল। তার চোখে এখন অশ্রু। অশ্রু সামলাতে ঠোঁট দুটো কাঁমড়ে ধরে রেখেছে সে। কিন্তু পারছে না। বরং সময়ের সাথে সাথে আরও যেন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছে। তাই আর দাঁড়াল না সে, ঘুরে হারিয়ে যেতে থাকল বৃষ্টির মধ্যে।

অনিক সামনে আরও খানিকটা ঝুকে এসে জোরে জোরে ডেকে উঠল, মা মা, তুমি যেও না, মা তুমি যেও না, এখানে এসো।

মহিলা আর ফিরে তাকাল না। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে।

অনিক এবার 'মা মা' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর শুধু কাঁদতেই থাকল।

মাথার উপর হাতের স্পর্শ পেয়ে মাথা উচু করে তাকাল অনিক। দেখল তার বাবা নাজমুল হাসান পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখাচোখি হতে তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, কী হয়েছে অনিক? এখানে জানালার পাশে এসেছ কেন?

অনিক বিড় বিড় করে বলল, কিছু হয়নি আব্বু?

তাহলে তোমার আম্মুকে ডাকছিলে যে। ঐ যে তোমার আম্মু, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

অনিক দরজার পাশে দাঁড়ান তার আম্মু শিখা রহমানের দিকে তাকাল। শিখা রহমান নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, কী হয়েছে অনিক?

অনিক কয়েকমুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, মা চলে গেছে।

শিখা রহমান চোখ কুঁচকে বললেন, মা চলে গেছে মানে! কী বলছ তুমি!

হ্যাঁ, ঐ যে ঐ বাগানের মধ্যে।

নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান দুজনেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না। অনিকের কথা শুনে তারা একেবারে হতভম্ব। অনিক এসব কী বলছে!

স্বপ্নের ঘোরে অনিক ভুল বলছে অনুমান করে শিখা রহমান অনিককে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি বোধহয় স্বপ্ন দেখেছ বাবা। ভয় নেই, এই যে আমি তোমার মা, তোমার পাশেই আছি।

অনিক বিড় বিড় করে বলল, না, তু..তু..তুমি আমার মা নও। আমর মা চলে গেছে, চলে গেছে।

কথাটা শোনার জন্য এবারও নাজমুল হাসান কিংবা শিখা রহমান কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বিস্ময় নিয়ে তারা দুজনে দুজনের দিকে তাকালেন। কিন্তু কেউই কারো দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারলেন না।

আট বছরের অনিক তখন আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

২

শিখা রহমান একটা এনজিওর পরিচালক। নিজে পরিচালক হলেও তার মধ্যে পরিচালক ভাব নেই। একেবারে সাদামাটা জীবন তার। অফিসে সবাই তাকে ডাকে শিখা আপা বলে।

মাঝে মাঝে অফিসে শিখা রহমানের কাজের ব্যস্ততা খুব বেশি থাকে। আজও কাজের ব্যস্ততা বেশি। কিন্তু কাজে তিনি মন বসাতে পারছেন না। কিছুক্ষণ পর পর গত রাতের অনিকের কথাগুলো তার মনে পড়ছে। অনিক বলেছে তিনি তার মা নন। কী ভয়ংকর ব্যাপার! ব্যাপারটা তিনি কিছুইতেই মেনে নিতে পারছেন না। অনিক তাকে মা বলে ডাকবে না যখনই এরকম চিন্তাটা মাথায় আসছে তখনই মাথাটা ঘুরে উঠছে।

শিখা রহমান যখন এরকম ভাবছেন তখন তার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ফোন করেছেন অনিকের স্কুলের ক্লাস টিচার। ফোন ধরতে ওপাশ থেকে ক্লাস টিচার বললেন, কেমন আছেন আপা?

হ্যাঁ ভালো। আপনি কেমন আছেন?

ভালোই আছি।

হঠাৎ ফোন করলেন যে?

আপনার সাথে একটা বিষয়ে কথা বলা দরকার ছিল।

কী বিষয়ে?

অনিকের বিষয়ে।

অনিকের নাম শুনতে কেন যেন শিখা রহমানের সমস্ত শরীরটা ঝাকি দিয়ে উঠল। তিনি জানতেন ক্লাস টিচার কথা বললে অনিকের ব্যাপারেই বলবেন। কিন্তু কেন যেন এখন তার ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে অনিক এমন কিছু করেছে যা গত রাতের মতোই ভয়ংকর।

ভয় কমাতে জোরে শ্বাস নিলেন শিখা রহমান। তারপর বললেন, কখন আসতে হবে?

এখনই চলে আসুন। স্কুল ছুটি হতে বেশি সময় বাকি নেই। কথা শেষে আপনি অনিককে সাথে করে নিয়ে যেতে পারবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে, আসছি।

লাইন কেটে দিয়ে শিখা রহমান গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। অনিক ক্লাস টুতে পড়ে। প্লে, নার্সারি, ওয়ান শেষ করে সে ক্লাস টুতে উঠেছে। পড়ালেখায় সে খুব ভালো। প্রত্যেকবারই ফার্স্ট

হয়। কোনো কিছু তাকে দুবার বলতে হয় না। কঠিন কঠিন পড়াগুলোও সে খুব সহজে বুঝে ফেলে। গত কয়েক বছরে স্কুল থেকে কখনোই তাকে ডাকা হয়নি। আজই প্রথম। কারণ কি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না শিখা রহমান। তাই ভাবলেন স্বামী নাজমুল হাসানকে একবার ফোন করবেন। কিন্তু নাজমুল হাসান আজ খুব ব্যস্ত। আটটা গার্মেন্টস্ এর মালিক হওয়ায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটার পর একটা মিটিংএ থাকতে হয়। আজ নাকি ইউরোপ থেকে বায়ার আসবে। সারাদিন তাদের নিয়ে ফ্যাক্টরি ভিজিটে থাকতে হবে। কাজেই ফোন করে লাভ হবে না।

শিখা রহমান স্কুলে এলে ক্লাস টিচার হামিদা ম্যাডাম একটা খাতা দেখিয়ে বললেন, এটা অনিকের খাতা আপা।

দেখতেই পাচ্ছি।

আজ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

কী ঘটনা?

আমি ক্লাসের সবাইকে খাতায় তাদের বাবা মার নাম এবং বাসার ঠিকানা লিখতে বলেছিলাম। অনিক যা লিখেছে তা সত্যি বিস্ময়কর!

শিখা রহমান চোখ কুঁচকে বললেন, কী লিখেছে?

এই যে দেখুন।

শিখা রহমান দেখলেন, অনিক তার বাবার নাম লিখেছে হারুনুর রশিদ, মায়ের নাম লিখেছে কুসুম, আর ঠিকানা লিখেছে গ্রাম - ইদ্রা, থানা - শিমুলতলী, জেলা - ফরিদপুর।

লেখাগুলো দেখে শিখা রহমানের মুখটা একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল।

ক্লাস টিচার হামিদা ম্যাডাম বলতে থাকলেন, আমি অনিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কেন এরকম লিখেছে? কেন সে তার বাবা মার সত্যিকারের নাম এবং ধানমন্ডি বাড়ির ঠিকানা লিখেনি? অনিক যে উত্তর দিয়েছে সেটা শুনলে আপনি আঁতকে উঠবেন।

কী উত্তর দিয়েছে ও?

অনিক বলেছে, ওর বাবা মা আর আব্বু আম্মু এক নয়। তারা আলাদা।

কী বলছেন আপনি!

একবার নয়, বেশ কয়েকবার আমি জিজ্ঞেস করেছি। প্রত্যেকবারই সে একই উত্তর দিয়েছে। একবার তো বলল, সে তার মায়ের কাছে চলে যাবে।

কী সাংঘাতিক!

সাংঘাতিক বলেই আপনাকে ফোন করেছি। আপনি স্কুল ছুটির পর ওকে সাথে করে নিয়ে যান। তারপর নিজে কথা বলুন। আমার মনে হয় সবকিছু বুঝতে পারবেন।

শিখা রহমান কোনো কথা বললেন না। শুধু উপরে নিচে মাথা দোলালেন।

স্কুল ছুটির পর গাড়িতে ফিরে আসার সময় শিখা রহমান অনিককে নিয়ে কেএফসিতে ঢুকলেন। কেএফসির চিকেন বার্গার অনিকের খুব প্রিয়। অনিক যখন বার্গার খাচ্ছে শিখা রহমান তখন অনিককে গভীর মনোযোগের সাথে দেখছেন। অনিককে একেবারে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, কোনোরকম অস্বাভাবিকতা নেই। বরং তাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অনিক উলটো প্রশ্ন করে বলল, আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছ কেন আম্মু?

না এমনিতেই, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে এজন্য।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, স্কুলে আজ তুমি কী কী করলে?

অনেক কিছু করলাম। ছবি আঁকলাম, গেমস্ খেললাম। জানো আম্মু, আজ আমি ছবি আঁকাতে দুইটা স্টার পেয়েছি।

তুমি তো খুব ভালো ছবি আঁক। হুবহু যে কোনো ছবি আকার তোমার অসাধারণ এক ক্ষমতা আছে। তোমার ক্লাস টিচার প্রায়ই আমাকে কথাটা বলেন।

আমিও জানি। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

কী ঘটনা!

ক্লাস টিচার আমার বাংলা খাতা ফেরত দেননি। সবাইকে বাবা মার নাম লিখতে বললে, বাড়ির ঠিকানা লিখতে বললে আমিও লিখি। শেষে সবার খাতা ফেরত দিলেও আমার খাতা ফেরত দেয় নি।

কেন দেয়নি?

বার্গারে কাঁমড় দিয়ে অনিক বলল, জানি না।

শিখা রহমান এবার একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, তুমি তোমার বাবার নাম কী লিখেছিলে?

অনিক খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, হারুনুর রশিদ।

মায়ের নাম?

কুসুম।

উত্তরগুলো শুনে শিখা রহমানের সমস্ত শরীরে ভয়ের শির শির একটা অনুভূতি বয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে তিনি পরের প্রশ্নটা করলেন, তোমার বাড়ির ঠিকানা?

গ্রাম - ইদ্রা। ইউনিয়নের নাম মনে নেই আম্মু। তবে থানার নাম মনে আছে, শিমুলতলী, জেলা - ফরিদপুর।

তুমি কী বলছ এসব!

অনিক এবার শিখা রহমানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, সত্য বলছি আম্মু।

না তুমি সত্য বলছ না। তোমার বাবার নাম নাজমুল হাসান, তোমার মার নাম শিখা রহমান আর তোমার বাসা যে ধানমন্ডি তাও তুমি জানো, তাই না?

অনিক সাথে সাথে সাথে বলল, না আম্মু তুমি ভুল বলছ। আবার বাবা মা তোমরা নও। তোমরা আমার আব্বু আম্মু। আমার বাবার নাম হারুনুর রশীদ আর মায়ের নাম কুসুম। আর গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে।

এসব তোমাকে কে শিখিয়েছে?

কেউ শিখায় নি। আমি জানি।

আমি বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয় বাসার নতুন কাজের বুয়া এই কাজ করেছে।

না আম্মু। বুয়া খুব ভালো।

তোমাকে আর বলতে হবে না। এখন থেকে আর হরুনুর রশীদ আর কুসুম এই নামগুলো মুখে আনবে না। বুঝলে?

বেশ ধমকের সাথে কথাগুলো বললেন শিখা রহমান।

অনিক কোনো কথা বলল না। চুপচাপ বার্গার খেতে লাগল। তবে বোঝা গেল বার্গার খাওয়ায় এখন আর তার মন নেই।

দুপুরের পর বাসায় ফিরে শিখা রহমান দ্বিতীয় কোনো চিন্তা ছাড়াই নতুন কাজের বুয়া সখিনাকে বিদেয় করে দিলেন। সখিনা বুয়াকে বাসা থেকে চলে যেতে দেখে অনিক খুব কষ্ট পেল। নিজের রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে সে 'মা মা' বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অনিকের কান্না দেখে শিখা রহমান যতটা না অবাক হলেন তার থেকে বেশি অবাক হলেন অনিককে 'মা মা' শব্দ করে কাঁদতে দেখে। জন্মের পর অনিক কখনও তাকে 'মা' বলে ডাকেনি। সবসময় আম্মা বলে ডেকছে এবং সেভাবেই তাকে শেখান হয়েছে। তাহলে অনিক আজ কেন 'মা

মা' বলে কাঁদছে? ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হল তার কাছে। তিনি ঠিক করলেন আজ আর অফিসে যাবেন না। বাসায় অনিকের সাথেই থাকবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি বাসায় থাকলেন ঠিকই কিন্তু মনের অস্বস্তিটা কিছুতেই দূর করতে পারলেন না।

৩

শিখা রহমান রাতে ঘুমানোর আগে নাজমুল হাসানকে সবকিছু খুলে বললেন। নাজমুল হাসান শুনে হাসতে হাসতে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলে শিখা রহমান বললেন, তুমি সবকিছু এরকম হালকাভাবে দেখো না।

নাজমুল হাসান হাসি মুখেই বললেন, হালকা ভাবে দেখছি না। গুরুত্ব দিয়েই দেখছি।

তাহলে হাসছ কেন?

হাসছি এ কারণে যে তুমি যা বলছ তা হাসিরই ব্যাপার। 'আম্মু' আর 'মা' একই সম্বোধন। এতে কোনো পার্থক্য নেই।

পার্থক্য যদি নাই থাকে তাহলে অনিক হঠাৎ করে 'মা' বলতে শুরু করবে কেন? আর কি বিশ্রী একটা ব্যাপার, 'কুসুম' নামের কেউ নাকি তার মা।

শিশুদের মনে কিছু ঢুকে গেলে সেটা বের করা কঠিন। আমার মনে হয় ওর মনের মধ্যে কোনোভাবে কুসুম নামটা ঢুকেছে। তাই সে মায়ের নাম কুসুম বলছে। এটা ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু নামটা কীভাবে ঢুকবে?

নাজমুল হাসান হেসে দিয়ে বললেন, কাজের মেয়ে সখিনা ঢুকিয়েছে। তুমিই তো এই কথা বললে।

আমি অনুমান করেছি। আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই।

তাহলে ওকে চাকরি থেকে বাদ দিয়ে ঠিক করোনি।

শিখা রহমান এবার খানিকটা রেগে উঠে বললেন, তাহলে কী ওকে আগামীকাল আবার আসতে বলব?

তুমি রেগে যাচ্ছ কেন?

রেগে যাচ্ছি এ কারণে যে তুমি আমাদের একমাত্র সন্তানের দিকে কোনো নজর দিচ্ছ না। সারাদিন আছ ব্যবসা বানিজ্য আর টাকা পয়সা নিয়ে।

এগুলো তো সব তোমাদের জন্যই করছি।

তা করছ, কিন্তু এত কিছুর তো আমাদের দরকার নেই। তুমি জানো, অনিককে পেতে আমাদের কত কষ্ট করতে হয়েছে, কত ধৈর্য ধরতে হয়েছে। আর এখন যদি অনিকের কিছু হয়ে যায় তাহলে...

কথাগুলো বলতে বলতে শিখা রহমান প্রায় কেঁদে ফেললেন।

নাজমুল হাসান সত্যি খুব বিব্রত হলেন। তিনি মাথা ঝাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, এখন বলো তুমি কী চাও?

অনিকের ব্যাপারটাকে তুমি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে এবং ওকে সময় দেবে। আজ সারাটা দিন কি তুমি অনিকের সাথে একবারও কথা বলেছ? না বলোনি। এটা অন্যায়।

আমি এসে দেখি ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

না ঘুমায়নি। ও ওর রুমে ছিল।

ঠিক আছে, আমি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেব এবং নিজে ওর সাথে কথা বলব। চলো এখন গিয়ে কথা বলি।

এত রাতে কথা বলার দরকার নেই। এতক্ষণে ঘুমিয়ে গেছে।

তারপরও দেখে আসি, যদি ঘুমিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আসি। এতে অন্তত বুঝতে পারবে তোমার মতো আমিও অনিককে ভালোবাসি।

কথাগুলো বলতে বলতে নাজমুল হাসান খাট থেকে নেমে এলেন। তার পিছন পিছন শিখা রহমানও এলেন। অনিকের রুমের সামনে এসে দুজনই থমকে গেলেন। অনিক ঘুমায় নি। এখনও জেগে আছে। এত রাতে অনিকের জেগে থাকার কথা নয়।

অনেকটা নিঃশব্দে দুজনে অনিকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অনিক টেবিলে বসে কাগজে কি যেন লিখছে। নাজমুল হাসান পিছন থেকে অনিকের মাথায় হাত রাখতে অনিক মাথা তুলে তাকাল। তারপর বলল, আব্বু তুমি?

হ্যাঁ, কি করছ?

চিঠি লিখছি।

এত রাতে চিঠি লিখছ, কাকে?

মাকে।

কী বলছ তুমি বাবা!

হ্যাঁ। মা খুব অসুস্থ, তাই তাকে চিঠি লিখছি।

তোমার মা অসুস্থ হতে যাবে কেন? তোমার মা তো সুস্থ। এই যে তোমার পাশে আছে।

না উনি আমার মা না, উনি আম্মু। মা গ্রামে থাকে।

ছিঃ অনিক। কে বলেছে তোমাকে এসব কথা?

কেউ বলেনি। আমি জেনেছি।

কীভাবে জেনেছ?

আমি জানি না। তবে আমি জেনেছি। মা খুব অসুস্থ। তাকে ডাক্তার দেখানো দরকার।

কে দেখাবে?

আমি দেখাব।

নাজমুল হাসানের ইচ্ছে হল অনিককে একটা ধমক দেয়। কিন্তু তিনি নিজেকে সংবরণ করলেন। তারপর টেবিলের উপর থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। অনিক লিখেছে,

মা,

আমি জানি তুমি অসুছত। তুমি ভেবো না, আমি আসছি। একটা মোবাইল ফোন থাকলে ভালো হতো, তোমার সাথে রোজ কথা বলতে পারতাম। তবে বৃসটি আর..

নাজমুল হাসান দেখলেন অসুস্থ আর বৃষ্টি বানান দুটো অনিক ভুল করেছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ক্লাস টু এর ছেলে অসুস্থ আর বৃষ্টি বানান ভুল করতেই পারে। কিন্তু অনিক এসব কী করছে? কাকে চিঠি লিখছে? নিজের প্রশ্নের নিজেই কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। শেষে অনিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ঘুমাবে না বাবা?

চিঠিটা শেষ করে তারপর ঘুমাব।

আর কি লিখবে?

জানি না। তবে..

তবে কি?

একটা বিষয় জানা দরকার। চিঠি কীভাবে পোস্ট করতে হয় আব্বু?

খামের উপর ঠিকানা লিখে তারপর পোস্ট করতে হয়।

খাম কোথায় পাব?

আমি তোমাকে কিনে দেব।

সত্যি আব্বু?

হ্যাঁ, এখন তাহলে ঘুমাও। না ঘুমালে কিনে দেব না।

চিঠিটা শেষ করে নেই।

আগামীকাল শেষ করবে, আজ না।

ঠিক আছে।

অনিক একেবারে সুবোধ ছেলের মতো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং শোয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল।

এতক্ষণ শিখা রহমান কোনো কথা বলেননি। এবার কথা বললেন, কী বুঝলে?

তুমি ঠিকই বলেছ, অনিকের কোনো সমস্যা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে অনিককে কোনো ডাক্তার দেখানো দরকার।

কোন ডাক্তার দেখাবে?

সম্ভবত ওর সমস্যাটা মানসিক। এজন্য কোনো সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখালে ভালো হবে। দেখি আগামীকাল খুঁজে বের করব।

আগামীকালই কিন্তু ডাক্তার দেখাবে। কাজের অজুহাতে আবার দেরি করবে না।

না দেরি করব না।

এরপর নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান দুজনেই শুয়ে পড়লেন। তবে দুজনের কেউই রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারলেন না। কারণ তারা নিশ্চিত হয়েছেন অনিকের জীবনে এমন কিছু ঘটেছে কিংবা ঘটছে যা ঘটার কথা নয়।

৪

নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান পুরাতন ঢাকায় ডাক্তার তরফদারের বাড়িতে এসেছেন। তাদের আসলে এখানে আসার কথা ছিল না। নাজমুল হাসানের এক বন্ধু যিনি নিজে কিনা ডাক্তার তিনি ডাক্তার তরফদারের নাম বলেছেন। তাই তারা তার কাছে এসেছেন। ঐ বন্ধু জানিয়েছেন ডাক্তার তরফদার নাকি খুবই ভালো। কিন্তু এখানে এসে দুজনেই হতাশ। কোনো রুগী নেই। বিশাল বাড়ি, জনমানবশূন্যই বলা যায়। নিচে একজন বয়স্ক দারোয়ানকে দেখা গেছে। দোতলা বাড়ির নিচ তলায় ডাক্তার তরফদার থাকেন। উপরে কে বা কারা থাকে বোঝা যাচ্ছে না। বলার মতো যে জিনিসটা এখানে আছে সেটা হলো অনেক অনেক বই। নিচ তলার যতটুকু দেখা যাচ্ছে পুরোটাই বলতে গেলে বইতে ঠাসা। একজন মানুষের যে কত বই থাকতে পারে এখানে না এলে বোঝা যাবে না।

নাজমুল হাসানদের এসে পৌঁছাতে পঁচিশ মিনিট দেরি হয়েছে। কারণ গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। টায়ার পরিবর্তন করে নতুন টায়ার লাগাতে এই পঁচিশ মিনিট লেগেছে। এজন্য তারা বেশ ভয়ে ছিলেন তাদের এক নম্বর সিরিয়াল আবার পিছিয়ে সবার শেষে চলে না যায়।

আজকাল ডাক্তারদের সিরিয়াল একবার মিস করলে সেটা ফিরে পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যপার। কিন্তু যখন এ বাড়িতে এসে তারা দেখলেন কোনো রুগী নেই হতাশ হওয়ার পাশাপাশি কিছুটা খুশিও হলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সবকিছু শুনলেন ডাক্তার তরফদার। তারপর বেশকিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। অনিক সম্পূর্ণ সুস্থ। বরং বার বার আব্বু আম্মু, বাবা মা বিষয়ে প্রশ্ন করে আপনারা ওকে বিভ্রান্ত করছেন। যাইহোক, আমি অনিকের সাথে কিছুক্ষণ একা কথা বলতে চাই। তারপর আপনাদের সাথে কথা বলব। আপনারা এই সময়টা কি করবেন? এক কাজ করুন। আমার ডান পাশে একটি রুম আছে। ঐ রুমটায় কিছু বই আছে। আপনারা বইগুলো গুনতে থাকুন। কোন তাকে কতগুলো বই আছে সেটা বের করে করে গুনবেন। ঠিক আছে?

নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান বেশ অবাক হলেন। তবে তারা দুজনের কেউ কিছু বললেন না। সম্মতি জানিয়ে রুমে ঢুকে বই গুনতে শুরু করলেন। বইয়ের বহর দেখে তাদের মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা, এত বই তারা কীভাবে গুনবেন?

ডাক্তার তরফদার এবার অনিকের দিকে তাকালেন। তারপর সামনে ঝুকে এসে বললেন, তোমার নাম তো অনিক, না?

অনিক খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিয়ে বলল, জি।

তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

ক্লাস টুতে।

স্কুল তোমার কেমন লাগে?

ভালো।

কী খেতে পছন্দ করো তুমি?

বার্গার।

ভেরি গুড।

ডাক্তার তরফদার এবার একটু সময় নিলেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, অনিক তোমার মা কেমন আছেন?

ভালো নেই, খুব অসুস্থ।

কীভাবে বুঝলে?

জানি না।

কী হয়েছে তার?

জানি না।

তোমার মায়ের সাথে তোমার শেষ কবে দেখা হয়েছে?

আজও দেখা হয়েছে।

কখন?

সকালে ঘুম থেকে উঠে।

তোমাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি?

হয়েছে। তবে খুব অল্প।

কেন অল্প কথা হয়েছে?

মা আজ বেশি অসুস্থ ছিল, এজন্য। আসলে...

আসলে কি?

আমার উপর মা বোধহয় রাগ করে আছে।

রাগ করে থাকবে কেন?

আমি যে আব্বু আম্মুর সাথে থাকি এজন্য। মা'র অসুখ, অথচ মার কোনো যত্ন নিতে পারছি না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

তাহলে তুমি তোমার মার কাছে যাচ্ছ না কেন?

আমি যেতে পারছি না। আমি পথ চিনি না। একটা চিঠি লিখেছি। আব্বু পোস্ট করে দেবে বলেছে। কিন্তু এখনও দেয়নি। দেরি করছে।

তোমার মা কি তোমাকে ভালোবাসেন?

খুব ভালোবাসে। এজন্যই বার বার আমার কাছে আসে।

তোমার মাকে তোমার কেমন লাগে?

অনিক মাথা নেড়ে বলল, খুব ভালো লাগে। এজন্যই মার কাছে যেতে চাই। তার কাছে থাকতে চাই।

কেন ভালো লাগে?

আগে মা সারাদিন আমার সাথে থাকত। আমার সাথে খেলত। আমাকে নিয়ে এখানে ওখানে যেত। আমরা বিলের মধ্যে যেতাম, মাছ ধরতাম, ধান ক্ষেতে যেতাম, সেখানে ছুটে বেড়াতাম, ঘুড়ি উড়াতাম, বৃষ্টিতে ভিজতাম। আবার রাতে এক সাথে বসে চাঁদ দেখতাম, তারা দেখতাম, জোছনা দেখতাম, কত মজা করতাম! তারপর কী যে হলো বলতে পারব না। মা হারিয়ে গেল। আবার এলো, তবে এবার মা খুব অসুস্থ। তারপরও সে আমার সাথে খেলতে চেষ্টা করে, আমিও তার সাথে খেলি।

আগে যখন তোমার মার সাথে মজা করতে তখন তোমাদের সাথে আর কে কে থাকত?

কেউ থাকত না। শুধু মা আর আমি।

তোমার বাবা থাকত না?

খুব কম থাকত।

এখন যখন তোমার মায়ের সাথে খেলা কর তখন তোমার বাবা থাকে না?

না থাকে না।

কতদিন পর পর তোমার মা তোমার কাছে আসে?

আমি যখন চাই তখনই আসে। আবার মা ডাকলে আমিও যাই।

তুমি না বললে তোমার মায়ের বাড়ি তুমি চিন না, তাহলে যাও কীভাবে?

এটা তো আসল যাওয়া না, নকল যাওয়া। কিছুক্ষণের জন্য যাওয়া। যাই, তারপর আবার চলে আসি। বেশিক্ষণ আমরা একজন অন্যজনের কাছে থাকতে পারি না।

কেন?

জানি না।

তোমার মা আগে সুস্থ ছিলেন, এখন বলছ অসুস্থ। কতদিন পর তিনি অসুস্থ হলেন?

জানি না।

ডাক্তার তরফদার লক্ষ করলেন প্রত্যেকটা উত্তর অনিক প্রশ্ন শেষ হওয়ার সাথে সাথে দিচ্ছে। তার মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। যে উত্তরগুলো সে জানে খুব দ্রুত দিয়ে দিচ্ছে আর যেগুলো জানে না সেগুলো খুব সহজভাবে 'জানি না' বলছে। এবার তিনি অনিককে কাছে টেনে তার পাশে ছোট্ট একটা টুলে বসালেন। তারপর বললেন, তোমার আব্বু আম্মু তোমাকে খুব আদর করেন, তাই না?

অনিক উপরে নিচে মাথা দুলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

তারা কি তোমাকে কখনও বকা দেন?

আম্মু দেয়, পড়া ঠিকমতো না হলে দেয়।

বেশি, নাকি অল্প?

অল্প।

তুমি কষ্ট পাও?

না কষ্ট পাই না।

কেন কষ্ট পাই না?

আম্মু আমাকে খুব ভালোবাসে।

কীরকম ভালোবাসে?

আমাকে বার্গার কিনে দেয়, খেলনা কিনে দেয়, ভিডিও গেম কিনে দেয়, আমাকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন ঘুরতে যায়, আরও অনেককিছু।

ডাক্তার তরফদার ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললে, সকাল থেকে উঠে তুমি কি কি করো?

অনিক এবার ডাক্তার তরফদারের চোখে তাকাল। তারপর প্রশ্ন করে বলল, আপনি আমার ডেইলি লাইফ জানতে চাচ্ছেন?

হ্যাঁ ডেইলি লাইফ।

সকালে ঘুম থেকে উঠি। তারপর বুয়া আমাকে দাঁত মেজে হাত মুখ ধূইয়ে দেয়, নাস্তা করিয়ে দেয়। ড্রাইভার আঙ্কেল আমাকে স্কুলে নিয়ে যায়, তারপর স্কুল থেকে নিয়ে আসে। বাসায় এলে বুয়া দুপুরের খাবার খাইয়ে দেয়। বিকেল টিচার এলে তার কাছে পড়ি। তারপর ভিডিও গেম খেলি।

কার সাথে খেল?

বুয়ার সাথে, না হলে কাজের ছেলে আব্দুলের সাথে। তবে আব্দুল ভালো, ওর সাথে খেলে মজা বেশি। ওর মাথায় বুদ্ধিও আছে। তারপর সন্ধ্যায় আম্মু এলে পড়তে বসি। রাতে খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ি।

সারাদিন তোমার আব্বুর সাথে কিছু করো না?

আব্বু খুব ব্যস্ত থাকে। আমি যখন স্কুলে যাই, তখন আব্বু ঘুমিয়ে থাকে। আবার যখন রাতে ঘুমাতে যাই আব্বু তখনও ফিরে আসে না। এজন্য আব্বুর সাথে আমার কথা কম হয়। তবে আব্বু খুব ভালো। আমি কিছু চাইলে সাথে সাথে কিনে দেয়।

ডাক্তার তরফদার ঠোঁট কাঁমড়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের স্কুলে ভ্যাকেশন মানে ছুটি কবে?

আগামী শনিবার থেকে, দশদিন।

এই ছুটিতে কী করবে?

জানি না, হয়তো বাসায় বসে থাকব।

কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হয়?

ইচ্ছে হয় আবার হয়ও না। বলতে পারব না।

কোন ইচ্ছেটা তোমার সবচেয়ে বেশি হয়?

মার কাছে যেতে ইচ্ছে হয়। মার সাথে খেলতে ইচ্ছে হয়, ঘুরতে ইচ্ছে হয়, হাসতে ইচ্ছে হয়, ঘুড়ি উড়াতে ইচ্ছে হয়, চাঁদ দেখতে ইচ্ছে হয়, বৃষ্টি ভেজা জোছনা দেখতে ইচ্ছে হয়।

ডাক্তার তরফদার ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'বৃষ্টি ভেজা জোছনা' দেখতে ইচ্ছে হয়?

হ্যাঁ, খুব সুন্দর।

কেন সুন্দর?

আকাশে যখন জোছনা থাকে আমি মায়ের কোলে মাথা রেখে জোছনা দেখি। তারপর হঠাৎ দেখি মেঘগুলো ছুটাছুটি শুরু করেছে। একসময় বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টিতে তখন জোছনাগুলো ভিজতে থাকে, খুব সুন্দর লাগে দেখতে।

তারপর কী হয়?

অনিক একটু চিন্তা করে বলল, আ..আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

ডাক্তার তরফদার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বয়স্ক দারোয়ান করিম চাচাকে ডাক দিলেন। তাকে বলে দিলেন অনিককে যেন সে বাড়ির চারপাশের গাছগুলো ঘুরিয়ে দেখায়। তারপর ডাক দিলে নাজমুল হাসান আর শিখা রহমানকে।

৫

ডাক্তার তরফদার চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। তারপর হঠাৎই সামনের দিকে ঝুকে প্রশ্ন করলেন, কতগুলো বই আছে রুমটাতে?

নাজমুল হাসান কিংবা শিখা রহমান দুজনের কেউই কোনো উত্তর দিলেন না।

ডাক্তার তরফদার আবার জিজ্ঞেস করলেন, কতগুলো বই গুনলেন?

এবার কথা বললেন নাজমুল হাসান। বললেন, আমার দুজনে আটশ তেইশটা বই গুনতে পেরেছি।

কে কতগুলো বই গুনেছেন?

আমি চারশ উনিশটা, আর শিখা চারশ চারটা।

যতটুকু সময় আপনারা পেয়েছেন তাতে আটশ তেইশটা বই খুব কম সংখ্যা। আরও বই গোনা উচিত ছিল।

সত্যি কথা বলতে কি আমরা বই গুনতে পারিনি।

কেন পারেন নি?

এবার কথা বললেন শিখা রহমান। বললেন, আসলে অনিকের সাথে আপনি কী কথা বলছিলেন সেগুলো আমরা শুনতে চেষ্টা করছিলাম।

ডাক্তার তরফদার এবার উপরে নিচে মাথা ঝাকিয়ে বললেন, এই ব্যাপারটাই আমি চাচ্ছিলাম। আপনারা সঠিক কাজই করেছেন। কারো সন্তান অসুস্থ থাকলে অন্য কাজে সে মন বসাতে পারে না। সন্তানের দিকেই নজর রাখে। এটা খুব স্বাভাবিক আচরণ এবং আপনারা তাই করেছেন। তারমানে আপনাদের আচরণ স্বাভাবিক আছে এবং নিজ সন্তানের প্রতি আপনাদের গভীর মমত্ববোধ রয়েছে। সন্তান বড় করার জন্য সন্তানের প্রতি মায়া থাকাটা খুব জরুরী। আর একটা বিষয় পরীক্ষা করছিলাম আমি। আপনাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কেমন সেটা। এজন্য দুজনকে একসাথে বই গুনতে দিয়েছি এবং আপনারা একসাথেই বই গুনেছেন। দুজনের সম্পর্কে সমস্যা থাকলে এটা সম্ভব হতো না। এটা অত্যন্ত শুভ সংবাদ। এমন অনেক দম্পতি আছে যারা বছরের পর একসাথে থাকে অথচ নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমোঝতা নেই, এমন কি দিনের পর দিন কথা পর্যন্ত বলে না। যাইহোক, আপনারা যেহেতু আমার আর অনিকের কথোপকথন শুনেছেন কী বুঝলেন?

নাজমুল হাসান বললেন, আমি অনিককে একেবারে সময় দেই না।

ঠিক ধরেছেন। আর কিছু?

দুজনেই চুপ।

ডাক্তার তরফদার এবার শিখা রহমানের দিকে ফিরে বললেন, আপনার কি মনে হয়?

অনিকের যতটুকু সময় দেয়া প্রয়োজন আমিও ততটুকু দেই না।

হ্যাঁ সত্যি। অনিক বড় হচ্ছে কাজের বুয়া কিংবা কাজের ছেলের কাছে। অথচ সন্তান আপনাদের। অনিকের প্রতি আপনাদের কারোরই ভালোবাসার কমতি নেই, ও যখন যা চাচ্ছে সবই আপনারা দিচ্ছেন। কিন্তু ওর যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, বাবা মায়ের ভালোবাসা, সেটা আপনারা দিচ্ছেন না। এজন্য ধীরে ধীরে সে আপনাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।

নাজমুল হাসান কিংবা শিখা রহমান কেউ কিছু বললেন না, শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

ডাক্তার তরফদার বলে চললেন, আসলে অনিক একা, খুব একা। সে মনে প্রাণে চায় আপনারা ওর সাথে সময় কাটান, ওকে নিয়ে ঘুরতে যান, খেলতে যান, ওকে আদর করেন। কিন্তু আপনাদের অতি ব্যস্ততার কারণে সেটা হয়ে উঠে নি আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা শুধু তাকে বঞ্চিত করা না, এটা এক ধরনের অন্যায়ও। দিনের পর দিন আপনাদের কাছ থেকে আদর, ভালোবাসা আশা করে শেষ পর্যন্ত তা না পেয়ে সে তার Subconscious Mind বা অবচেতন মনে একটা জগত সৃস্টি করে নিয়েছে। সেই জগতে কুসুম নামে তার একজন মা এবং হারুনুর রশীদ নামে একজন বাবা আছে। তারা তাকে খুব আদর করে। তবে মায়ের আদরটা বেশি। এজন্য সে বার বার মায়ের কথা বলে। বিশেষ করে মায়ের সাথে খেলার কথা, ক্ষেতের মধ্যে ছুটে বেড়ানোর কথা, ঘুড়ি উড়ানোর কথা, জোছনা দেখার কথা, জোছনার মাঝে বৃষ্টি দেখার কথা এগুলো। সম্ভবত এই কাজগুলোই সে আপনাদের সাথে করতে চেয়েছে। কিন্তু সে আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করেও পারেনি। শেষে অবচেতন মনের কাল্পনিক বাবা মায়ের সাথে সে খেলতে শুরু করে এবং এখন অবচেতন মন মাঝে মাঝেই তার Conscious Mind বা সচেতন মনকে ছাপিয়ে উঠে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় সচেতন মনের সত্য থেকে অবচতন মনের কল্পনাকেই সে বেশি প্রাধান্য দেয়, বিশ্বাস করে। এটা ভালো না, শিশুদের জন্য বেশি ভালো না। যেভাবেই হোক অনিকের অবচেতন মনের ঐ কল্পনার বাবা মাকে হত্যা করতে হবে। তা না হলে তাকে সুস্থ করা যাবে না। আর এ কাজটা করতে হবে আদর ভালোবাসা দিয়ে। এই আদর ভালোবাসা আপনাদেরই দিতে হবে, অন্য কারো নয়। আমার কথা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন?

নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান একই সাথে মাথা দুলিয়ে বললেন, জি বুঝতে পেরেছি।

যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে এখন কী করতে হবে? অনিককে নিয়ে আপনাদের কোথাও ঘুরতে যেতে হবে। কোথায় যেতে চান?

কক্সবাজার অথবা দেশের বাইরে কোথাও। বললেন, নাজমুল হাসান।

না, গ্রামের বাড়িতে যান। যে কারণেই হোক গ্রামের প্রতি ওর মনে একরকম প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামে নিয়ে ওর সাথে আপনারা কথা বলবেন, গ্রামের পরিবেশে খেলবেন, হাসবেন, মাছ ধরবেন, ঘুড়ি উড়াবেন, গাছ থেকে ফল পাড়বেন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক মানসিক এই অসুস্থতাটা দু'একদিনে ঠিক হবে না, বেশ সময় লাগবে। এজন্য আপনাদের ধৈর্য ধরে অনিককে সময় দিতে হবে। অনিক যেন কখনও একা না থাকে। আর হ্যাঁ আপনাদের বাড়ি কোথায়?

নাজমুল হাসান বললেন, আমি মূলত ঢাকায়ই বড় হয়েছি। তবে সিরাজগঞ্জে আমাদের গ্রামের বাড়ি আছে।

তাহলে ওখানেই ওকে নিয়ে যান। আর নানাবাড়ি?

ঢাকায়ই।

হু বুঝতে পেরেছি। ছোটবেলা থেকে অনিকের সোসালাইজেশনটা (Socialization) একেবারেই হয়নি। অর্থাৎ সমাজের সবকিছুর সাথে মেশা হয়নি, অথচ হওয়া উচিত ছিল। এটা করতে হবে। আর হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম?

কি প্রশ্ন?

আপনাদের যে বয়স তাতে আপনাদের সন্তান অনেক বেশি বয়সের হওয়ার কথা। কিন্তু অনিকের বয়স মাত্র আট।

আসলে বিয়ের পর দশ বছর আমাদের কোনো সন্তান হয়নি।

আপনাদের বয়স কত?

আমার আটচল্লিশ আর শিখার তেতাল্লিশ ।

আর আপনাদের সন্তান মানে অনিকের বয়স মাত্র আট।

জি।

যেহেতু অনেকদিন পর আপনারা সন্তান পেয়েছেন আপনাদের সন্তানের প্রতি আরও মনোযোগি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা হননি। এটা অনেক বড় ভুল। এরকম ভুল আর করবেন না।

জি আচ্ছা করব না।

তাহলে আপনারা গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন এটাই চূড়ান্ত। ঘুরে এসে আমার সাথে দেখা করবেন। আমি ফলাফলটা জানতে চাই।

ঠিক আছে।

কথা শেষে সবাই বাইরে এসে দেখে অনিক খুব আনন্দে বাইরে দারোয়ানের সাথে কথা বলছে। ডাক্তার তরফদার বললেন, দেখেছেন, দুজনে কী সুন্দর খেলছে!

শিখা রহমান সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তাই তো দেখতে পাচ্ছি।

আপনারা অনিককে সময় দিলে অনিকও ঐভাবে আপনাদের সাথে আনন্দ নিয়ে খেলবে।

এবার নাজমুল হাসান খানিকটা কৌতূহলী হয়ে বললেন, এত বড় বাড়িতে আপনি আর আপনার ঐ দারোয়ান থাকেন? আর কেউ থাকে না।

ডাক্তার তরফদার মাথা দুলিয়ে বললেন, থাকে, দোতলায় আরও দুজন থাকে। একজন হল ইমরান, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ, আর অন্যজন তার স্ত্রী পরী যে কিনা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নারী এবং সবচেয়ে সুন্দর রান্না করতে পারে। সময় হলে একদিন আপনাদের পরীর হাতের পায়েস খাওয়াব। দেখবেন সেই স্বাদ সারাজীবন জিহ্বায় লেগে থাকবে।

ওরা কি আপনার আত্মীয়?

না আত্মীয় না। ভাড়াটিয়া হিসেবে উঠেছিল, এখন নিজের সন্তানের মতো থাকছে। মাঝে চলে যেতে চেয়েছিল, আমি নিজেই নিষেধ করেছি। কে না চায় পৃথিবীর গুণী মানুষের সান্নিধ্যে থাকতে! আমার এখানে যারা আছে সবাই গুণী, শুধু আমি ছাড়া।

আপনি অবশ্যই গুনী মানুষ। কিন্তু আপনার ঐ বৃদ্ধ দারোয়ান গুণী হবে কীভাবে?

করিমের কথা বলছেন। ও আমার সাথে আছে বহু বছর ধরে। সবাই ওকে করিম চাচা বলে ডাকে। দেখতে বেশ বয়স্ক মনে হলেও বয়সে আমার থেকে কয়েক বছরের ছোট। করিমেরও বিশেষ গুন আছে।

কী গুন?

ডাক্তার তরফদার একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, করিম ভবিষ্যৎ বলতে পারে।

করিম চাচা ভবিষ্যৎ বলতে পারে!

হ্যাঁ।

নাজমুল হাসান চোখ বড় বড় করে বললেন, তা কীভাবে সম্ভব!

আমি জানি না। আপনাদের আসতে যে দেরি হচ্ছিল সেটার কারণ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছিল আপনাদের নাকি গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেছে। সত্য কিনা জানি না।

নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান দুজনেই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন। নাজমুল হাসান এতটাই বিস্মিত হলেন যে কথা হারিয়ে ফেললেন। এই বাড়িতে আসার পর থেকে তারা দুজন যতক্ষণ ডাক্তার তরফদারের সাথে ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যকেউ ডাক্তার তরফদারের সাথে দেখা করেনি। শুধু করিম চাচা অনিককে নেয়ার জন্য একবার এসেছিল। সেসময় টায়ার নিয়ে ডাক্তার তরফদার আর করিম চাচার মধ্যে কোনো কথা হয়নি। তার মানে করিম চাচা আগেই ডাক্তার তরফদারকে বিষয়টা বলেছে। কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব ঠিক মাথায় ঢুকল না নাজমুল হাসানের। তাই তার মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। তার কেন যেন মনে হতে লাগল তিনি একটা অশরীরীয় বাড়ির মধ্যে থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। বাড়িটা যেমন অদ্ভুত, এই বাড়ির মানুষগুলোও অদ্ভুত। ডাক্তার তরফদার মানুষটা সবচেয়ে অদ্ভুত। তবে তিনি ভালো, তার সবকিছুই তার ভালো লেগেছে। একই সাথে বিস্মিতও হয়েছেন তিনি। তবে খুশি হয়েছেন এটা বুঝতে পেরে যে অনিকের অসুখের কারণটা জানা গেছে। তিনি আশাবাদী এই ভেবে যে অনিকের অসুখটা খুব একটা জটিল না এবং অল্পদিনেই অনিক সুস্থ হয়ে উঠবে।

৬

গ্রামের বাড়িতে আসার পর অনিক যেন নতুন জীবন পেল। সারাদিনই সে কোনো না কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকছে। মাছ ধরা, গাছে উঠা, ফল পাড়া, ঘুড়ি উড়ান, ক্ষেতের মধ্যে ছুটে বেড়ান থেকে শুরু করে সবকিছুতে তার দারুন উৎসাহ। এর মধ্যে নতুন একটা জিনিস সে শিখেছে। আর সেটা হল সাঁতার কাটা। নাজমুল হাসান নিজে তাকে সাঁতার শিখিয়েছেন। সাঁতরাতে এখন অনিকের খুব ভালো লাগে। সমবয়সী বেশ কয়েজন বন্ধুও জুটে গেছে তার। সারাদিন তাদের নিয়ে বেশ আনন্দে সময় কাটায় সে।

গ্রামে আসার চতুর্থ দিন বিকেলে বাইরে ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। এজন্য অনিক বিকেলে বাইরে যেতে পারল না। এতে অবশ্য তার মন খারাপ হল না, কারণ তার বন্ধুরা সবাই তার সাথে খেলার জন্য বাড়িতে চলে এসেছে।

সন্ধ্যার পর ঝড়ো বাতাস কমে এলেও আকাশে মেঘের ছুটাছুটি শুরু হল। মেঘ দেখে অনিকের বন্ধুরা সবাই চলে গেল। অনিক ভিতরে গেলেও একটু পর পর বারান্দায় এসে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা নজর এড়াল না শিখা রহমানের। তিনি অবাক হয়ে বললেন, অনিক, তুমি একটু পর পর বারান্দায় যাচ্ছ কেন?

আকাশে আজ অনেক বড় চাঁদ উঠবে।

তাই নাকি?

হু।

কে বলেছে তোমাকে?

আমি জানি।

শিখা রহমান জানেন না আজ পূর্ণিমা কিনা। কখন পূর্ণিমা আর কখন না, তা শহরে কখনও মনে রাখা হয় না। গ্রামে আসার পরও গত চারদিনেও ব্যাপারটা লক্ষ করেননি তিনি। অনিক হয়তো লক্ষ করেছে ভেবে বললেন, গতরাতে আকাশে চাঁদ ছিল?

জানি না।

তাহলে বুঝলে কীভাবে আজ বড় চাঁদ উঠবে?

জানি না।

চাঁদ দেখে কী করবে তুমি?

জোছনা দেখব।

জোছনা। জোছনা দেখার কী হলো?

জোছনা সুন্দর। জোছনা রাত বেশি সুন্দর হয় যখন জোছনা রাতে বৃষ্টি হয়। আজ রাতে বৃষ্টি হবে। জোছনাগুলো সব বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। আমি বৃষ্টি ভেজা জোছনা দেখব।

বৃষ্টি ভেজা জোছনা?

হু, খুব অল্প সময়ের জন্য হয়। বৃষ্টি ভেজা জোছনার রাত সবচেয়ে সুন্দর।

কে বলেছে তোমাকে?

মা বলেছে।

'মা' শব্দটা শুনে চমকে উঠলেন শিখা রহমান। এ কয়েক দিনে অনিক একবারও 'মা' শব্দটা উচ্চারণ করেনি। আজ করেছে। কিন্তু কেন? তাছাড়া আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন তিনি। অনিক তাকে 'আম্মু' ডাকা কমিয়ে দিয়েছে। এখনকার কথপোকথনে একবারও তাকে আম্মু বলে ডাকেনি। ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর তার জন্যে। তার কেমন যেন ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে অনিক কেমন যেন পালটে যাচ্ছে এবং একসময় সে সত্যি সত্যি নতুন এক অনিকে পরিণত হবে। নতুন ঐ অনিক তাকে চিনবে না। কী ভয়ংকর ব্যাপার! ভাবতেই শিউরে উঠলেন তিনি।

অনিককে কাছে টেনে অনিকের চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে শিখা রহমান এবার বললেন, তোমার মা কখন বলেছে বাবা?

একটু আগে।

একটু আগে!

হ্যাঁ, ঝড়ের মধ্যে মা এসেছিল। তুমি বারান্দায় না এলে আমি মায়ের সাথে কথা বলতে পারতাম। তুমি কেন এলে?

শিখা রহমান চোখ বড় বড় করে বললেন, আমি তোমার কাছে আসব না?

না আসবে না। মা যখন আসবে তখন আসবে না। তুমি এলে মা থাকে না। চলে যায়।

তুমি এসব কী বলছ অনিক! আমিই তোমার মা।

না, তুমি আমার মা না। তুমি আমার আম্মু।

মা আর আম্মু একই।

না এক না। অনেক পার্থক্য।

কী পার্থক্য?

মা অনেক আপন, আম্মু আপন না। মা অনেক ভালো, আম্মু অত ভালো না। মা আমাকে অনেক আদর করে, আম্মু অত আদর করে না। মা বৃষ্টি ভেজা জোছনা দেখাতে পারে, কিন্তু আম্মু পারে না।

স্তম্ভিত শিখা রহমান নিজের ঠোঁট কাঁমড়ে ধরে বললেন, বৃষ্টি ভেজা জোছনা কী?

জোছনার মাঝে যখন বৃষ্টি হয় তখন জোছনাগুলো সব ভিজে যায়। ঐ জোছনাকে বলে বৃষ্টি ভেজা জোছনা।

ঠিক আছে তুমি চাইলে আমি তোমাকে বৃষ্টি ভেজা জোছনা দেখাব।

তুমি পারবে না।

কেন পারব না?

জানি না।

শিখা রহমান খুব হতাশ হলেন। তিনি চাচ্ছেন না এই প্রসঙ্গে বেশি আলোচনা করতে, এতে অনিকের মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই বললেন, চলো রাতের খাবার খাবে।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

খেতে ইচ্ছে না করলেও কিছু খেতে হবে। তোমার জন্য ফ্রাইড রাইস রেঁধেছি, চলো খাবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনিক খেতে বসল। খাওয়ার মাঝে দুবার সে বারান্দায় ছুটে গেল, বৃষ্টি ভেজা জোছনা দেখবে বলে। কিন্তু তখন পর্যন্ত জোছনাও উঠেনি, বৃষ্টিও শুরু হয়নি। আবছাভাবে আকাশের মেঘগুলোকে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে শুধু। শিখা রহমান অনিককে বাধা দিলেন না। অনিক যা করতে চাচ্ছে করুক। ডাক্তার তরফদার এরকমই বলেছেন। অনিকের স্বাধীনতায় বাধা না দেয়ার জন্য, বরং দেখার জন্য অনিক কি করে বা করতে চায়।

সারাদিনের ক্লান্তির কারণে অনিক খুব বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারল না। সে বেশ আগে ঘুমিয়ে পড়ল। অনিক ঘুমিয়ে পড়লে শিখা রহমান নাজমুল হাসানকে সন্ধ্যার ব্যাপারটা বললেন। নাজমুল হাসান লম্বা শ্বাস ছেড়ে বললেন, অনিকের সুস্থ হতে আরও সময় লাগবে। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।

শিখা রহমান খানিকটা অস্থির হয়ে বললেন, কিন্তু অনিক 'বৃষ্টি ভেজা জোছনা' দেখবে, এরকম একটা কঠিন কথা বলল কীভাবে? কথাটা এমন হতে পারত বৃষ্টির মধ্যে জোছনা দেখবে কিংবা জোছনার মধ্যে বৃষ্টি দেখবে। 'বৃষ্টি ভেজা জোছনা' কথাটা কেমন যেন কাব্যিক, তাই না? এই বয়সে এরকম কথা ওর বলার কথা নয়। নিশ্চয় কেউ ওকে বলেছে।

হয়তো বলেছে।

কে?

তাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

কীভাবে খুঁজব?

নাজমুল হাসান খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললেন, সেটা তো আমিও জানি না।

এরপর দুজনই চুপ হয়ে গেলেন।

মাঝ রাতের পর কেন যেন হঠাৎ নাজমুল হাসানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরের মধ্যে একটা জিরো পাওয়ারের লাইট জ্বালানো ছিল। এজন্য ভিতরে সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন। দরজা খোলা দেখে খুবই বিস্মিত হলেন তিনি। আরও বিস্মিত হলেন অনিককে না দেখে। সাথে সাথে শিখা রহমানকে ডেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে যা দেখলেন তাতে তিনি একেবারে হতবিহ্বল হয়ে গেলেন। অনিক ঝির ঝির বৃষ্টির মধ্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে অনিক বুঝি কিছু একটা দেখছে।

নাজমুল হাসান ছুটে গিয়ে অনিককে কোলে তুলে ভিতরে নিয়ে এলেন। তারপর তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে দিতে দিতে বললেন, অনিক বাইরে গিয়েছিলে কেন?

অনিক কিছু বলল না, শুধু অদ্ভুত দৃষ্টিতে নাজমুল হাসানের দিকে তাকিয়ে থাকল।

নাজমুল হাসান এবার অনিকের শরীর ঝাকি দিয়ে বললেন, অনিক তোমার কী হয়েছে?

অনিক এবারও কোনো কথা বলল না। বরং চোখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকাল।

নাজমুল হাসান এবার হাত দিয়ে অনিকের মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে এনে বললেন, অনিক কথা বলো, এই যে আমি তোমার বাবা।

অনিক এবার সরাসরি নাজমুল হাসানের চোখে তাকাল। তারপর বিড় বিড় করে বলল, আমার বাবা মারা গেছে।

নাজমুল হাসানের মনে হলো তার শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা শীতর স্রোত নিচের দিকে নেমে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, কী বলছ তুমি! এই যে আমি তোমার বাবা! কে বলেছে আমি মারা গেছি?

অনিক আগের মতোই বিড় বিড় করে বলল, মা বলেছে।

মা, কোন মা?

আমার মা। বাইরে ছিল।

কী বলছ? বাইরে তো কেউ নেই?

আগে ছিল। এখন নেই।

কোথায় গেছে?

চলে গেছে। জোছনার সাথে চলে গেছে। বলেছে আবার আসবে।

নাজমুল হাসান কী বলবেন কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি অনিকের শরীরটা মুছে দিয়ে নিজের পাশে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। শুইয়ে দেয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে গেল অনিক। নিজের স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তে তিনি তাকে কাঁদতে দেখেলেন। বিয়ের পর নিজের স্ত্রীকে তিনি কখনও এভাবে কাঁদতে দেখেননি। আজই প্রথম।

৭

পরের দিন সকাল থেকে অনিকের প্রতি আরও মনোযোগী হয়ে উঠলেন নাজমুল হাসান। অনিকের সকল আচরণ তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন। তাদের বাড়ির এক কোনায় একটা পাটখড়ির ঘর আছে। ঘরটা খুব ছোট। ভিতরে একটা চৌকি পাতা আর ছোট্ট একটা মাচা আছে। অনেক আগে যখন বাড়িতে রাখাল ছিল তখন রাখাল ঐ ঘরে থাকত। এখন কেউ থাকে না। অযত্ন অবহেলায় ঘরটা জরাজীর্ণ প্রায়।

নাজমুল হাসান লক্ষ করেছেন অনিক প্রায়ই ঘরটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে চারপাশে একা একা ঘুরে। বাড়িতে আসার দ্বিতীয় দিনে অনিক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ঐ ঘরটা কার আব্বু?

তিনি বলেছিলেন, ওটা আমাদের ঘর।

কে থাকে ওখানে?

কেউ থাকে না।

কেউ না?

না।

আগে কে থাকত?

রাখাল থাকত। তাও অনেক আগে। তখন আমরা বাড়িতে অনেক গরু পালতাম। এত গরু যে দেখলে তুমিও অবাক হতে।

আমি ঘরটা দেখব আব্বু।

ওটা তো ভেঙ্গে গেছে। ভিতরে কিছু নেই। সাপ-টাপ থাকতে পারে। দেখি কাউকে দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে তোমাকে ভিতরে নিয়ে যাব।

ঘরটা সম্পর্কে আর কোনো কথা হয়নি তাদের। ঘরের ভিতরেও নিয়ে যাওয়া হয়নি অনিককে। অথচ আজ সকালে তিনি দেখলেন অনিক চুপি চুপি ঘরটার মধ্যে ঢুকে গেল। তিনি খুব অবাক হলেন। শেষে পিছু নিলেন অনিকের। অনিক ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে একবার

চৌকিটার দিকে তাকাচ্ছে আবার তাকাচ্ছে ডান পাশের মাচার দিকে। তারপর কখনও উপরের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে অনিক যেন কিছু খুঁজছে।

নাজমুল হাসান একবার ভাবলেন অনিককে ডাকবেন। পরে সিদ্ধান্ত পালটালেন। অনিক কি করে তিনি দেখতে চান। অনিক আগের মতোই এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু খুঁজছে। কিন্তু যা খুঁজছে তা পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। শেষে খানিকটা হতাশ হয়ে ঘরটা থেকে অনিক বের হয়ে এলো।

নাজমুল হাসান সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি অনিকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, এখানে এসেছ কেন বাবা?

অনিক খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিয়ে বলল, ঘরটা দেখতে এসেছিলাম।

এই ঘরটা দেখার কি হলো?

এটা আমাদের ঘরের মতো।

আমাদের ঘর মানে?

মায়ের ঘর। মা আর আমি এরকম একটা ঘরে থাকতাম।

কী বলছ তুমি এসব?

হ্যাঁ।

এরপর অনিক একা একাই হেঁটে উঠোনের দিকে চলে গেল। সেখানে তার কয়েকজন বন্ধু এসেছে। ওদের সাথে সে ক্রিকেট খেলা শুরু করল। অনিক এখন একেবারে স্বাভাবিক। কে বলবে কিছুক্ষণ আগে অনিক যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো শুনলে যে কেউ চমকে উঠবে।

সারাটা দিন অনিক স্বাভাবিকই কাটাল। রাতে সে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েও পড়ল। অনিক ঘুমানোর পর নাজমুল হাসান সকালের ঘটনাটা শিখা রহমানকে বললেন। শিখা রহমান সবকিছু শোনার পর নিজে থেকে বললেন, আমি জানি না কেন ঐ ঘরটার প্রতি অনিক আকৃষ্ট হয়েছে। আমি আর একটা বিষয় লক্ষ করেছি। তুমি করেছ কিনা জানি না?

কী বিষয়?

অনিককে নিয়ে যখন পিছনে বাগানের মধ্যে যাই তখন অনিক কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়।

কী রকম?

কেমন একটা দৃষ্টিতে বড় বড় গাছগুলোর দিকে তাকায়। দৃষ্টিটা ঠিক স্বাভাবিক না। তারপর আশেপাশে কাউকে খুঁজতে থাকে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি না বাগানের মধ্যে ও কাকে খুঁজে।

কাকে খুঁজবে?

আমি জানি না। অবশ্য ব্যাপারটা সব সময় ঘটে না। এই পর্যন্ত দু'বার ঘটেছে। আমার কী মনে হয় জানো?

কী মনে হয়?

শিখা রহমান এবার উঠে বসে সরাসরি নাজমুল হাসানের চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, ও কাউকে দেখতে পায়।

কী বলছ! কাকে দেখবে?

আমি যা বলছি তা সত্য। কাকে দেখতে পায়, কীভাবে দেখতে পায় জানি না। তবে আমি নিশ্চিত অদৃশ্য কাউকে অথবা কিছু একটাকে অনিক দেখতে পায় এবং যখন অদৃশ্য ঐ জিনিসটা থাকে না তখন সেটাকে খুঁজতে থাকে।

নাজমুল হাসান তোতলাতে তোতলাতে বললেন, আ...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। জিনিসটা কী?

যা বলছি তা সত্য কিনা আমি নিজেও জানি না। সবই আমার ধারণা। আমার ধারণা থেকে বলছি জিনিসটা ভূত-প্রেত কিংবা অশুভ কোনো আত্মা হতে পারে।

নাজমুল হাসান একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, বাস্তবে কি এটা সম্ভব?

সম্ভব যে না আমি জানি এবং বিশ্বাস করি। এজন্যই তোমার সাথে আলোচনা করছি।

আমরা ভূত-প্রেত নিয়ে চিন্তা না করি। অনিক জানলে ওর মনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে। বরং ঢাকায় গিয়ে ডাক্তার তরফদারের সাথে কথা বলি। দেখি উনি কী বলেন।

ঠিক আছে।

দরজার উপরের ছিটকিনিটা আটকেছ আজ?

হ্যাঁ আটকে দিয়েছি। অনিক চাইলেও বাইরে যেতে পারবে না।

আজ বোধহয় পূর্ণিমা, না?

হ্যাঁ। বাইরে অনেক জোছনা।

বহুদিন জোছনা দেখি না।

আমিও বহুদিন জোছনা দেখি না। মনে হচ্ছে তোমার হাত ধরে জোছনার নিচে হাঁটি। কিন্তু কেন যেন সায় পাচ্ছি না।

নাজমুল হাসান বললেন, আমারও একই অবস্থা। মনের কোথায় যেন একটা কষ্ট, অনেক বড় একটা কষ্টটা। কষ্টটাকে কিছুতেই চেপে রাখা যাচ্ছে না। তোমার কী এমন হচ্ছে?

আমার কষ্ট তোমাকে বোঝাব কীভাবে? অনিক তো আমাকে এখন আর আম্মু বলে ডাকে না। আমি যে ওর মা সেটা ও ভুলেই গেছে।

আমাকে আজ সকালে আব্বু বললেও তা খুব বেশি বার না।

ও মনে হয় আমাদের মা বাবা বলে স্বীকার করছে না।

কেন করবে না?

জানি না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

আমাদের আরও ধৈর্য ধরতে হবে। ওর চিকিৎসা শেষ করতে সত্যি লম্বা সময় লাগবে।

অবস্থার উন্নতি হতে থাকলে না হয় ধৈর্য ধরা যেত। কিন্তু অবস্থা তো ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে।

এখানে আসার পর প্রথম কয়েকদিন তো ভালোই ছিল। এখন আবার এমন করছে কেন?

শিখা রহমান কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তবে নাজমুল হাসান বুঝলেন শিখা রহমান কাঁদছেন। তার কান্নাটা আজ নীরব কান্না। তিনি জানেন নীরব কান্নাটা অনেক কষ্টের। কারণ তাতে কষ্টটা বুকের মধ্যেই থেকে যায়। ঐ রকম কষ্ট নিয়েই একসময় ঘুমিয়ে গেলেন দুজন।

মাঝ রাতের কিছু পরে ঘুম ভাঙল শিখা রহমানের। যখন তিনি দেখলেন অনিক পাশে নেই নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠলেন। শুরু হলো অনিকের খোঁজ। দরজাটা খোলা, দরজার পাশে একটা চেয়ার। ঐ চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে অনিক দরজার ছিটকিনি খুলেছে। তারপর বের হয়ে গেছে ঘর থেকে। উঠোনে তাকে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল বাড়ির বাগানে। মরা একটা মেহগনি গাছের পড়ে থাকা কান্ডের উপর বসে আছে অনিক। তাকিয়ে আছে আকাশের বিশাল বড় চাঁদের দিকে। হাত নেড়ে নেড়ে কারো সাথে কথাও বলছে। কিন্তু তার আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাঝরাতে এই দৃশ্যটা শিখা রহমানের কাছে এতটাই ভয়ংকর মনে হলো যে তিনি নিজের উপর আর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারলেন না। জ্ঞান হারিয়ে নিচে পড়ে গেলেন।

ডাক্তার তরফদারের সামনে অসহায় ভঙ্গিতে বসে আছেন নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান। অনিক খেলছে করিম চাচার সাথে। গত এক সপ্তাহে গ্রামে যা যা ঘটেছে তার সবকিছু শুনেছেন ডাক্তার তরফদার। তিনি ভেবেছিলেন এর মধ্যে অনিক বেশ সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে অনিক আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই সবকিছু ভালোমতো জানতে তিনি নাজমুল হাসানে দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি বলছেন রাতে দুবার অনিক বাড়ির বাইরে বের হয়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, প্রথমবার বাড়ির সামনেই ছিল। দ্বিতীয়বার একেবারে বাগানের শেষ মাথায় চলে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়বার সে কী করছিল?

আকাশে জোছনা দেখছিল, আর হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছিল।

কী কথা?

আমরা পিছন থেকে স্পষ্ট শুনতে পাইনি। তবে যতটুকু বুঝেছি তা হলো তার পাশে কেউ একজন বসেছিল। তাকে সে 'মা' বলে সম্বোধন করছিল। কিন্তু যে বসেছিল তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত।

অদ্ভুতই বটে! ঐদিন বৃষ্টি ছিল না?

না কোনো বৃষ্টি ছিল না।

কতক্ষণ ছিল ওভাবে?

বলতে পারব না। ঘুম থেকে উঠে দেখি নেই, শিখাই প্রথম ওঠে। তারপর খুঁজতে খুঁজতে বাগানে গিয়ে পাই। পিছন থেকে ডাক দিলেও অনিক শুনছিল না। সে যেন অন্য কোনো জগতে ছিল। তারপর একসময় সে ফিরে তাকায়।

ডাক্তার তরফদার চেয়ারে হেলান দিয়ে কয়েক সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আমি বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে চাই। আপনারা যেরকম বলছেন এরকম হওয়ার কথা না। কেন হচ্ছে সেটা আমাকে বের করতে হবে। যদি না পারি তাহলে অনিকের সঠিক চিকিৎসা সম্ভব হবে না। যাইহোক ওর অসুস্থতার কারণ বের করার জন্য আমার অনেক তথ্যের প্রয়োজন। এজন্য আপনাদের আমি কিছু প্রশ্ন করব। আপনাদের সেগুলোর উত্তর দিতে হবে।

নাজমুল হাসান সায় দিয়ে বললেন, অব্যশই দেব।

ডাক্তার তরফদার একটু সময় নিলেন। তারপর প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, অনিকের জন্ম হয়েছে কোথায়? মানে আপনাদের বাসায় নাকি হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে?

সিটি ক্লিনিকে।

নারমাল ডেলিভারি ছিল, নাকি সিজার করিয়েছিলেন?

সিজার করিয়েছিলাম।

জন্মের পর থেকে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো অসুখ হয়েছিল কি? এই যেমন ধরুন যক্ষা, ডিফথেরিয়া, টাইফয়েড কিংবা এরকম কিছু।

না।

কখনও কোনো আঘাত পেয়েছিল? অ্যাকসিডেন্ট কিংবা পড়ে যাওয়া, হাত পা ভেঙ্গে যাওয়া।

না।

কখনও কী মারাত্মক ভয় পেয়েছিল? দিনে কিংবা রাতে যে কোনো সময়?

নাজমুল হাসান শিখা রহমানের দিকে তাকাতে শিখা রহমান এবার বললেন, না ভয় পায়নি।

ওর অন্য কোনো অসুস্থতা আছে নাকি?

ঠিক বুঝলাম না।

যেমন পানিকে ভয় পাওয়া, উপরে উঠলে ভয় পাওয়া কিংবা কোনো প্রাণী বিড়াল কুকুর বা অন্যকিছু দেখলে ভয় পাওয়া। অথবা দিন কিংবা রাতের কোনো নির্দিষ্ট সময়কে ভয় পাওয়া।

এরকম কোনোকিছু এখন পর্যন্ত আমরা দেখিনি।

অর্থাৎ অনিকের আট বছরের জীবনে আপনারা ওর কোনো বড় ধরনের মানসিক কিংবা শারীরির সমস্যা দেখেননি।

না দেখিনি, শুধু বর্তমানটা ছাড়া।

ডাক্তার তরফদার আবার কিছুটা সময় নিলেন। তারপর সামনে রাখা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, আপনারা দুজনেই ব্যবসা কিংবা অফিস নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এই সময়ে ওকে বাসায় দেখাশুনা করত কে?

শিখা রহমান বললেন, হাসিনা নামের এক কাজের বুয়া ছিল। ঐ বুয়াই দেখাশুনা করত।

বয়স কত ছিল তার?

পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে।

সে এখন কোথায়?

মাস তিনেক আগে চলে গেছে।

কোথায় গেছে?

ছেলের কাছে।

কতদিন ছিল আপনাদের বাড়িতে?

আমাদের বিয়ের প্রথম থেকে, তা প্রায় সতের বছর হবে।

হঠাৎ চলে গেল যে।

ছেলে বড় হয়েছে। এখন কোথায় যেন চাকরি করে। মাকে কারো বাড়িতে কাজ করতে দিতে চায় না। এতে নাকি সম্মানহানি ঘটে।

ঘাসিনা বুয়া কোথায় থাকে এখন?

হাজারীবাগ এলাকায়।

আমাকে ঠিকানাটা দিন।

ঠিকানা আমি জানি না। তবে আমাদের ড্রাইভার আর দারোয়ান তার বাসা চিনে। আপনি চাইলে তার ছেলের ফোন নম্বর দিতে পারি।

ঠিক আছে দিন।

হাসিনা বুয়ার ঠিকানা দিয়ে কী করবেন?

প্রয়োজন হলে কথা বলব। এখন বলুন, হাসিনা বুয়া চলে যাওয়ার পর অনিককে দেখাশুনার দায়িত্ব কে পালন করছে?

সখিনা নামের নতুন একটা মেয়ে ছিল। তাকে অবশ্য আমি বিদেয় করে দিয়েছি।

কেন?

আমার ধারণা হয়েছিল ঐ সখিনাই অনিককে আব্বু আম্মুর পরিবর্তে মা বাবা বলা শিখিয়েছিল এবং ওর পরামর্শেই অনিক অদ্ভুত আচরণ করছিল।

এখন কী বুঝতে পারছেন?

মনে হচ্ছে সমস্যাটা সখিনা নয়, অন্য কিছু।

অন্য কিছু মানে?

শিখা রহমান এবার ইতস্তত করে বললেন, ভূত-প্রেত এরকম কিছু কী হতে পারে?

ডাক্তার তরফদার এবার হো হো করে জোরে হেসে উঠলেন। তারপর নিজেই বললেন, আপনারা কী ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন?

নাজমুল হাসান এবার নিজে থেকে বললেন, করি না কিন্তু সন্দেহটা মন থেকে যাচ্ছে না।

যাচ্ছে না এ কারণে যে আপনারা অনিককে খুব ভালোবাসেন। ভালোবাসেন বলে সবসময় শঙ্কিত থাকেন যেন ওর কোনো অমঙ্গল না হয়, এই আশঙ্কা থেকেই সন্দেহটা সৃষ্টি হয়েছে। যাইহোক, ভূত-প্রেতের ব্যাপারটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা শুধুই মানসিক। আমাদের কারণটা খুঁজে বের করতে হবে। যদি পারি তাহলে চিকিৎসা কোনো সমস্যা নয়। আপাতত যে কাজগুলো করবেন সেগুলো হলো,

১. অনিকের উপর সবসময় লক্ষ রাখবেন।
২. অনিক যেন কখনও একা না থাকে সেটা নিশ্চিত করবেন।
৩. অনিকের কোনো কাজে বাঁধা দেবেন না, সব কাজ ওকে করতে দেবেন। তবে অপরাধ কিংবা ওর শারীরিক ক্ষতি হতে পারে সেরকম কাজ থেকে ওকে নিবৃত্ত রাখবেন।
৪. অনিক আসলে কী চায় সেটা বোঝার চেষ্টা করবেন।
৫. চিকেন ফ্রাই, চিপস্, ফ্রাইড রাইস, চকলেট জাতীয় খাবার পরিহার করবেন। এগুলো শরীরে এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তবে প্রথমেই বন্ধ করে দেবেন না। ধীরে ধীরে কমাতে থাকবেন যেন অনিক কিছু বুঝতে না পারে।
৬. অনিকের সাথে প্রচুর সময় কাটাবেন, খেলবেন, গল্প করবেন, হাসবেন।
৭. কোনো বিষয়ে ওকে বকাবকি করবেন না, ভুল করলে বরং বুঝিয়ে বলবেন।
৮. কোনো ওষুধ খাওয়াতে হলে আমাকে জানিয়ে খাওয়াবেন।
৯. অনিককে বুঝতে দেবন না যে সে মানসিকভাবে অসুস্থ। অসুস্থতার কথা ওকে কোনোভাবেই বলা যাবে না।
১০. অনিকের আচরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়মিত আমাকে জানাবেন।

শিখা রহমান দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললেন, শুধু উপরের নির্দেশনাগুলো মেনে চলব? কোনো ওষুধ দেবেন না? ওষুধ ছাড়া..

ডাক্তার তরফদার শিখা রহমানকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, না কোনো ওষুধ দেব না। আগেই বলেছি মানসিক রোগ ওষুধে সারে না। যেহেতু সমস্যাটা মনের এজন্য মন দিয়েই সারাতে হয়। তবে শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা থাকলে তখন ওষুধের প্রয়োজন হয়। এজন্য আমি আপনাদের কিছু টেস্ট দিচ্ছি।

নাজমুল হাসান অবাক হয়ে বললেন, আমাদের মানে!

হ্যাঁ, অনিক এবং আপনাদের দুজনের। এই টেস্টগুলো করতে হবে। যে কোনো প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে গেল হতো। কিন্তু আমি একটা ল্যাবের কথা বলে দিচ্ছি। ওখানে যাবেন আপনারা। আপনাদের কাছ থেকে পঞ্চাশভাগ ডিসকাউন্টও রাখবে। আমি আমার চিকিৎসায় সাধারণত কাউকে প্যাথলজিক্যাল টেস্ট দেই না। আপনাদের দিচ্ছি কারণ আমার একটা বিষয় জানা দরকার। যিনি প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করবেন তাকে আমি কিছু নির্দেশনা দেব। এজন্য নির্দিষ্ট জায়গায় আপনাদের পাঠাচ্ছি। ওখানেই টেস্টগুলো করবেন আপনারা। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। টেস্টের রেজাল্ট দেখে পরের দিন বাকি কথা বলব।

নাজমুল হাসান আর শিখা রহমান বাইরে এসে দেখেন করিম চাচা অনিককে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনিককে নিয়ে শিখা রহমান গাড়িতে উঠলেও নাজমুল হাসান উঠলেন না। তিনি করিম চাচার দিকে ফিরে বিড় বিড় করে বললেন, চাচা, অনিক খুব অসুস্থ, তাই না?

করিম চাচা পিট পিট করে তাকাল। তারপর বলল, ঠিক হইয়া যাবে, চিন্তা কইরেন না। যান, বাড়ি যান।

কথাগুলো বলে করিম চাচা বাগানের দিকে চলে গেল। নাজমুল হাসানের আজ আগের দিনের মতোই করিম চাচা মানুষটাকে খুব অদ্ভুত মনে হলো।

৮

নাজমুল হাসান ব্যবসার কাজ কমিয়ে দিয়েছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অনিককে বেশি বেশি সময় দেবেন। তিনি লক্ষ করেছেন অনিক তার সাথে মিশতে খেলতে বেশি পছন্দ করে। তার সাথে থাকতেও পছন্দ করে। এরকম বিশ্বাস থেকে তিনি আজ নিজে অনিককে স্কুল থেকে নেয়ার জন্য এসেছেন।

স্কুল শেষ হলে অনিক গাড়িতে উঠার সময় অবাক কণ্ঠে বলল, আব্বু তুমি এসেছ!

হ্যাঁ, তোমাকে নিতে এলাম।

তুমি তো কখনও আমাকে নিতে আসো না।

এখন থেকে আসব।

কেন?

নাজমুল হাসান সামনে ঝুকে অনিকের কপালে একটা চুমু খেলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি এজন্য।

অনিক চোখ কুঁচকে বলল, তুমি আমাকে সত্যি ভালোবাসো?

অবশ্যই ভালোবাসি।

তাহলে আমি যা চাই তুমি দাও না কেন?

নাজমুল হাসান হেসে দিয়ে বললেন, এমন কি আছে আমি তোমাকে দেই নি। তুমি যা যা চাও সবই দেই। তারপরও যদি কিছু বাকি থাকে আজ কিনে দেব। বল কি চাও?

না তুমি সবকিছু আমাকে দাও না।

কী দেই নি?

আমি মার কাছে একটা চিঠি লিখেছিলাম। সেটা তুমি পাঠানোর ব্যবস্থা করবে বলেছিলে। সেটা করো নি।

নাজমুল হাসান ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি অনিক এরকম একটা কথা বলবে। মানসিকভাবে প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেলেন তিনি। তারপর বললেন, তুমি তোমার মার কাছে চিঠি পাঠাতে চাও?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করছি। চিঠিটা কোথায়? তোমার খাতায়?

না, নতুন একটা চিঠি লিখেছি।

আমাকে দেখাবে না?

না, তোমাকে দেখাব না। এটা আমার আর মার ব্যপার। তোমার না। কাজেই তুমি দেখতে পারবে না।

নাজমুল হাসান লক্ষ করলেন অনিকের কথার মাঝে সামনে বসা ড্রাইভার রফিক পিছনে তাকিয়েছে। তদের পারিবারিক ব্যাপারগুলো ড্রাইভারকে জানতে দেয়া উচিত হবে না ভেবে তিনি বললেন, রফিক, সামনে তাকিয়ে গাড়ি চালাও। আর একটা স্টেশনারী দোকানের সামনে দাঁড়াও, খাম কিনতে হবে।

নাজমুল হাসান বুঝতে পারেননি মোবাইল, ইমেইলের এই যুগে একটা সরকারী চিঠির খাম খুঁজে পাওয়া কতটা কঠিন। অবশেষে পোস্টঅফিসে এলেন তিনি। সেখান থেকে একটা খাম কিনে ঠিকানা লেখার সময় জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখব?

অনিক খুব উৎসাহের সাথে বলল, মা - কুসুম, আর ঠিকানা, গ্রাম - ইদ্রা, থানা - শিমুলতলী, জেলা - ফরিদপুর।

অনিক যেভাবে বলল, নাজমুল হাসান সেভাবেই সবকিছু লিখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এবার পোস্ট করে দেই?

কীভাবে পোস্ট করতে হয়?

ঐ যে লাল বাক্সটা দেখতে পাচ্ছ, ঐটাতে ফেললেই হবে।

আমি ফেলে দিচ্ছি।

কথাটা বলেই অনিক খামটা নিয়ে নিল। তারপর নিজে লাল বাক্সটার মধ্যে ফেলল।

গাড়িতে ফিরে আসার সময় অনিক বলল, চিঠি যেতে কত দিন লাগবে আব্বু?

চার পাঁচদিন লাগবে।

অনেক দিন। চিঠি যেতে এত দিন লাগে কেন?

বেশ দূরে যাবে তো তাই।

ফরিদপুর কত দূরে?

বেশ দূরে। যেতে পাঁচ ছয় ঘন্টা লাগে।

তাহলে চিঠি যেতে চার পাঁচদিন লাগবে কেন?

কিছু নিয়ম কানুন আছে। প্রথমদিন চিঠিগুলো কোনটা কোন জায়গায় যাবে সব ভাগ হবে, দ্বিতয়দিন ফরিদপুর পাঠানো হবে, এর পরদিন থানায় যাবে, এরপর দিন গ্রামে। এতে সময় লেগে যায় বাবা।

ফরিদপুর কীভাবে যেতে হয়?

বাসে যেতে হয়।

কীভাবে বাসে যেতে হয়?

গাবতলী থেকে টিকিট কেটে বাসে উঠলে ফরিদপুর যাওয়া যায়। কঠিন কিছু না।

প্রসঙ্গ এড়াতে নাজমুল হাসান অনিককে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললেন, কী খাবে বলো? তোমাকে নিয়ে আজ আমি বাইরে খাব।

আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

তারপরও যদি কিছু খেতে চাও।

না আব্বু কিছু খাব না, বাসায় যাব।

নাজমুল হাসান আর কোনো কথা বললেন না। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে সরাসরি বাসায় যেতে বললেন। বাসায় অবশ্য তিনি বেশিক্ষণ থাকলেন না। অফিসে এলেন। তার অফিসে তার খুব বিশ্বস্ত এক লোক আছে। নাম হোসেন। বয়স সাতাশ আটাশ বছর। হোসেনকে ডেকে বললেন, হোসেন, তুমি এক কাজ করবে?

কী কাজ স্যার?

নাজমুল হাসান কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তারপর একটু সময় নিয়ে বললেন, তুমি ভূত- প্রেতে বিশ্বাস করো?

হোসেন এরকম প্রশ্ন আশা করেনি। তাই অপ্রস্তুতভঙ্গিতে বলল, না স্যার।

কেন?

আমি বাস্তববাদী মানুষ। নিজে কখনও ভূত-প্রেত-জ্বিন দেখিনি, তাই বিশ্বাস করি না।

নাজমুল হাসান আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আমার যে একজন ভূতের ওঝার সাথে কথা বলা দরকার। ঠিক ভূতের ওঝা না, আধ্যাত্মিক কেউ।

আমি ঠিক বুঝলাম না স্যার।

আসলে আমি নিজেও জানি না আমি কী বলছি। তবে এটুকু বুঝতে পারছি আমার এমন কারও সাথে কথা বলা দরকার যার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে।

স্যার আপনি অনুমতি দিলে আমি খুঁজে দেখতে পারি।

কীভাবে খুঁজবে?

ঢাকায় অনেক ছোট বড় পীর আছে, তাদের কাছে যেতে পারি। নতুবা কোনো দরবেশ আছে কিনা অনুসন্ধান করে দেখতে পারি। আসলে স্যার এরকম কাজ আগে করিনি তো, তাই সঠিক উপায়টা বলতে পারছি না। তবে আমার বিশ্বাস কোনো না কোনোভাবে আধ্যাত্মিক কাউকে আমি খুঁজে বের করতে পারব।

ঠিক আছে যাও, যখন পাবে আমাকে জানাবে।

হোসেন চলে গেলে নাজমুল হাসান নিজেই কফি বানালেন। কিন্তু তিনি কফি খেলেন না। অফিসের সহকারী ম্যানেজার কিছু ফাইলপত্র নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে অহেতুক তাকে ধমকাধমকি করলেন। এতে তার নিজের খারাপ মনটা আরও খারাপ হল। সাধারণত তিনি অফিসে কারো সাথে এরকম আচরণ করেন না। এরপর পার্সোনাল এসিসটেন্সট হাবিবকে ডেকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বললেন। পার্সোনাল এসিসন্টে হাবিব কিছু বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নাজমুল হাসানের কঠিন মুখ দেখে ভয়ে আর কিছু বলল না।

সিগারেট চলে এলে লাইটার খুঁজলেন নাজমুল হাসান। লাইটার নেই শুনে প্রচন্ড জোরে এক ধমক লাগালেন হাবিবকে। হাবিব বেচারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, স্যার আপনি তো সিগারেট খান না।

খাই না তাতে কি, যা ব্যাটা লাইটার নিয়ে আয়, নইলে ম্যাচ নিয়ে আয়।

লাইটার এবং ম্যাচ দুটোই এলো। অফিসের মধ্যে যারা সিগারেট খায় তাদের কাছ থেকে জোগাড় করেছে হাবিব। ভয়ে ভয়ে লাইটার আর ম্যাচ টেবিলের উপর রেখে সে বের হয়ে গেল।

নাজমুল হাসান বহুদিন সিগারেট খান না। ইউনিভার্সিটিতে থাকতে খেতেন। তাও প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনা। আজ তার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। তাই তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিগারেটে টান দিলেন না। কিছুক্ষণ সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে থেকে, আগুন নিভিয়ে অবশেষে ফেলে দিলেন সিগারেটটাকে।

নাজমুল হাসান উপলব্দি করলেন কিছুক্ষণ আগের ভয়ংকর রাগটা তার এখন আর নেই। তবে তিনি কাঁদছেন। কেন কাঁদছেন জানেন না। টেবিলের উপর টিস্যু থাকলেও তিনি টিস্যু দিয়ে চোখ মুছলেন না। কেন যেন তার মনে হচ্ছে আজ কেঁদেই বেশি আনন্দ পাচ্ছেন!

০৯

ডাক্তার তরফদার কাজের বুয়া হাসিনার বাসায় এসেছেন। হাজারীবাগে একটা পুরাতন বাড়িতে ছেলের কাছে হাসিনা বুয়া থাকে। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটাতে হাসিনা বুয়ার ছেলে আর ছেলের বউ থাকে। আর অন্যটাতে হাসিনা বুয়া থাকে।

ডাক্তার তরফদার নিজের পরিচয় দিয়ে অনিকের সবকিছু খুলে বললে হাসিনা বুয়া বলল, আপনে কী প্রশ্ন করবেন আমারে করেন। আমি জানলে উত্তর দিব। অনিক অসুস্থ এইডা জানতাম না। জাইনা খুব কষ্ট পাইলাম।

আমার বিশ্বাস ও সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু কারণটা ঠিক ধরতে পারছি না। এজন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে এসেছি।

কী তথ্য?

আপনি তো অনিকদের বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন?

হুঁ, অনিকের জন্মেরও প্রায় আট দশ বছর আগে থেইকা।

অনিকের জন্ম হয়েছিল কোথায়?

সিটি ক্লিনিকে।

জন্মের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

আমি হাসপাতালেই আছিলাম। বুঝেন তো, বিয়ার দশ বছর পর শিখা আপার বাইচ্চা হইছে। কত সেবা শ্রশ্রূষার দরকার আছিল।

অনিক কতদিন পেটে ছিল?

ঠিক বুঝলাম না?

মানে যতদিন একটা বাচ্চা মানুষের পেটে থাকার কথা, অর্থাৎ আমরা যে বলি দশ মাস দশদিন, ততদিন কী ছিল?

হাসিনা বুয়া মনে করতে চেষ্টা করে বলল, না অতদিন আছিল না। মাস দেড়েক আগে অনিক হইছিল।

এত আগে অনিকের জন্ম হয়েছিল কেন?

অনিক যহন প্যাটে আটমাস তহন আপায় বাথরুমে গেলে পইড়া যায়। তারপর তারে হাসপাতালে নেয়া হয়। অবস্থা খারাপ দেইখা ডাক্তার তাড়াতাড়ি অপারেশন কইরা বাইচ্চাডা বাইর করে। তারপর প্রায় বিশ দিন অনিক ইনকিউবেটরে আছিল। খালি মায়ের দুধ খাওয়াবার সময় নিয়া আসত।

ঐ সময় শিখা রহমান কোথায় ছিলেন?

কেবিনে। কয়েকদিন পর সুস্থ হইলে নিজেই ইনকিউবেটরের রুমে গিয়া অনিকরে দেইখা আসত।

আপনি কী যেতেন তার সাথে?

হ যাইতাম।

ডাক্তার তরফদার একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, ঐ সময়ে ইনকিউবেটরের রুমে কতগুলো বাচ্চা ছিল?

হেইডা তো মনে নাই। প্রত্যেকদিনই চাইর পাঁচজন কইরা থাকত। মোট বিশদিন ঐ ঘরে আছিল অনিক। ঐ বিশ দিনে সত্তর আশি জন তো হবেই।

সংখ্যাটা একেবারে কম না।

তাতে কী?

ডাক্তার তরফদার সোজা হয়ে বসে বললেন, না কিছু না। আচ্ছা অনিকদের কোনো আত্মীয় স্বজন আছে নাকি যার নাম কুসুম?

আমার জানা মতে নাই।

অথবা বাড়িতে কুসুম নামে কেউ কী কখনও এসেছে?

মনে করবার পারতেছি না।

ভালো মতো মনে করতে চেষ্টা করুন।

হাসিনা বুয়া কিছুক্ষণ মনে করার চেষ্টা করে বলল, না মনে পড়তেছে না।

অনিকের তো কখনও কোনো অসুখ বিসুখও হয়নি? মানে বড় ধরনের কোনো অসুখ।

না, তারে সবাই খুব যত্ন করতাম। দশ বছর পর সন্তান হইছে, বুঝেনই কী যত্নে আছিল হে! অসুখ হবে ক্যামনে? আমি নিজে খুব লক্ষ রাখতাম। কোনো রোগ-বালাই হবার দেই নাই।

আপনি ছাড়া কী আর কেউ কখনও অনিককে পেলেছে?

না, আমিই পালছি। আমি আসার পর কী হইছে জানি না।

আপনি কী কখনও অনিকের মাঝে কোনো অস্বাভাবিক কোনোকিছু দেখেছেন? যেমন ধরুন ওর ভয় পাওয়া, অতিরিক্ত কান্না করা, কিংবা কোনোকিছু দেখে আতংকিত হওয়া - এরকম কিছু?

না কোনো সময় দেহি নাই।

ডাক্তার তরফদার ঠোঁট কাঁমড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আমি আপনাকে এখন একটা খুব অস্বাভাবিক প্রশ্ন করব। আপনি ভেবেচিন্তে উত্তর দেবেন। তবে প্রশ্নটা শুধুই আপনাকে করছি। কাজেই অন্য কাউকে বিষয়টা বলবেন না। আর মনে রাখবেন এই প্রশ্নটা করা হচ্ছে অনিকের মঙ্গলের জন্য। অনিক বা অন্য কারো কোনা ক্ষতি করার জন্য নয়।

প্রশ্নডা কী করেন। আমি কাউরে কিছু বলব না।

ডাক্তার তরফদার সরাসরি হাসিনা বুয়ার চোখে তাকালেন। তারপর টেনে টেনে বললেন, আপনি কী বিশ্বাস করেন অনিক নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমানের নিজের সন্তান?

প্রশ্নটা শুনে হাসিনা বুয়া জিহ্বায় কাঁমড় দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, এইডা আপনে কী প্রশ্ন করলেন! আমি শিখা আপারে নিজে অনিকরে পেটে ধরবার দেখছি। জন্মও হইছে ক্লিনিকে, আমার সামনে।

তারপরও অনেক কিছু ঘটে।

এইক্ষেত্রে কিছুই ঘটে নাই। অনিক শিখা আপার নিজের সন্তান।

ডাক্তার তরফদার আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। তিনি উঠে চলে আসতে চাইলে হাসিনা বুয়া আসতে দিল না। তাকে চা খাইয়ে তারপর ছাড়ল। হাসিনা বুয়ার এই আপ্যায়নটা খুব ভালো লাগল ডাক্তার তরফদারের।

ডাক্তার তরফদার এরপর এলেন সিটি ক্লিনিকে। ক্লিনিকের একজন পরিচালক, ডাক্তার শাফিউর রহমান তার পরিচিত হওয়ায় এখান থেকে সহজেই তথ্যগুলো পেলেন তিনি। তথ্য সহজে পাওয়া গেল এ কারণে যে এখানকার সবকিছুই কম্পিউটারাইজড। অনিকের জন্মদিনে মোট আটটি শিশুর জন্ম হয়েছে। তিনটি ছেলে শিশু এবং পাঁচটি মেয়ে শিশু। এই ছেলে শিশু তিনটির মধ্যে একটির মায়ের নামও কসুম কিংবা বাবার নাম হারুনুর রশিদ নয়। একে একে বিশদিনের শিশুদের তালিকা এবং তাদের বাবা মায়ের নাম পরীক্ষা করলেন ডাক্তার তরফদার। কিন্তু লাভ হলো না। কুসুম কিংবা হারুনুর রশিদ নামের কারো সন্তারের জন্মের কথা জানা গেল না। সবার বাবা মায়ের নামই ভিন্ন।

শেষে খানিকটা হতাশ হয়ে ডাক্তার তরফদার ডাক্তার শাফিউর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, বাচ্চাগুলো জন্ম হওয়ার পর তোমরা ওদের সনাক্ত করে ইনকিউবেশনে রাখো কীভাবে? সব বাচ্চা তো প্রায় একই রকম দেখতে।

ডাক্তার শাফিউর রহমান বললেন, হাতে ব্যান্ড পরা থাকে। সেই ব্যান্ডে নাম, রুম নম্বর, ব্লাড গ্রুপ এবং বাবা কিংবা মায়ের নাম লেখা থাকে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, হাসপাতাল থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত ঐ ব্যান্ড হাত থেকে খোলা হয় না। তুমি দেখতে চাও?

ডাক্তার তরফদার সায় দিয়ে বললেন, দেখতে চাই।

চলো আমার সাথে।

ডাক্তার তরফদার বেবি কেয়ার রুম এবং ইনকিউবেশন রুম ঘুরে দেখলেন। ওখানে প্রত্যেক বাচ্চার হাতে একটা করে ব্যান্ড লাগানো। ব্যান্ডগুলো হাত থেকে খুলে যাওয়া সহজ নয়। কাজেই একজনের বাচ্চা অন্যজনের সাথে পাল্টো যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তারপরও পৃথিবীতে অসম্ভব, অকল্পনীয় কিছু ঘটে, এটা খুব ভালোমতোই জানেন ডাক্তার তরফদার। এজন্য বেশ কয়েকবার মনোযোগের সাথে বাচ্চাগুলোকে দেখলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু পেলেন না।

ডাক্তার তরফদার সিটি ক্লিনিক থেকে বের হয়ে আসার আগে জন্মের সময় অনিকের যে রক্তের গ্রুপ ছিল সেটা জেনে নিলেন। রক্তের গ্রুপ ছিল বি পজেটিভ। অনিকের রক্তের গ্রুপটা তার জানা নেই। জানতে পারলে নিশ্চিত হওয়া যেতে এই অনিক সেই অনিক কিনা। এরকম একটা চিন্তা থেকে ডাক্তার তরফদার ঠিক করলেন তিনি অনিকদের বাসায় যাবেন। অনিকের আম্মা শিখা রহমানের সাথেও তার কিছু কথা বলার আছে। এরকম চিন্তা থেকে তিনি অনিকদের বাসার উদ্দেশে রওনা দিলেন।

১০

ডাক্তার তরফদার অনিকদের বাসায় এসে প্রথমে বাসার চারপাশটা ঘুরে দেখলেন। বিশাল দোতলা বাড়ি। এরকম আলীশান বাড়ী সচরাচর দেখা যায় না। বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ড, ড্রাইভার, বাবুর্চিসহ ফুটফরমায়েশ খাটার মানুষের অভাব নেই। তারপরও বাড়িটাতে কেমন যেন শূন্যতা, বাড়ির কোথাও আনন্দের লেশমাত্র নেই। এরকম একটা বাড়িতে থাকলে মানুষের অসুস্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ডাক্তার তরফদার ফোন করে এসেছেন। এজন্য শিখা রহমান নিজেই অপেক্ষা করছিলেন। ড্রইং রুমে বসতে বসতে তিনি বললেন, আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারবেন?

শিখা রহমান সাথে সাথে বললেন, অবশ্যই।

চা আসতে সময় লাগল না। আগেই যেন তৈরি করা ছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ডাক্তার তরফদার বললেন, কেমন আছেন?

শিখা রহমান ম্লান হেসে বললেন, আপনি তো বুঝতেই পারছেন।

আপনাকে খুব হতাশ মনে হচ্ছে। অনিক আপনাকে আর আম্মু বলে ডাকছে না, তাই না?

হ্যাঁ।

আপনি মন খারাপ করবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের উপর আস্থা রাখুন।

দিনে দিনে আস্থা হারিয়ে ফেলছি। কেন যেন মনে হচ্ছে অনিক আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

না যাবে না। আপনি ওর জন্মদাত্রী মা। তাই না?

হ্যাঁ।

চাইলেও সন্তান আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না। সন্তান আর মায়ের বন্ধনটা এরকমই। আচ্ছা বলুন তো, অনিকের চোহারার সাথে আপনার চেহারার সবচেয়ে বেশি মিল কোথায়?

শিখা রহমান ভ্রূ কুঁচকে বললেন, হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন যে!

না মানে ব্যাপারটা আপনি লক্ষ করেছেন কিনা তা জানার জন্য প্রশ্নটা করেছি।

অনিকের নাক আর চোখ আমার মতো।

আমার পর্যবেক্ষণের সাথে হুবহু মিলে গেছে। এখন এই প্রশ্নটা করার পিছনে যে কারণ সেটাতে আসি। যে কোনো কারণেই হোক অনিক বিশ্বাস করছে না আপনি ওর মা। জানি না কেন? কারণ যাই হোক না কেন, ওকে বিশ্বাস করাতে হবে আপনি ওর জন্মদাত্রী মা। এক্ষেত্রে বিশ্বাস সৃষ্টি করার অন্যতম উপায় হল শারীরিক মিল। আপনার এবং অনিকের নাক এবং চোখ যে একইরকম একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে সেটা বোঝাবেন, মিলগুলো দেখিয়ে দেবেন। এতে ভালো কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিখা রহমান মাথা দুলিয়ে বললেন, ঠিক আছে।

অনিক কোথায়?

ওর ঘরে খেলছে।

কার সাথে খেলছে?

এতক্ষণ আমার সাথে খেলছিল। এখন খেলছে সখিনার সাথে।

যে সখিনাকে আপনি বুয়ার চাকরি থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন সেই সখিনার সাথে।

হ্যাঁ।

আমি অনিকের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

অবশ্যই বলবেন। আমি ওকে ডাকব?

আমি চাচ্ছি ওর রুমে গিয়ে ওর সাথে কথা বলতে।

পাশের রুমটাই, আসুন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

ডাক্তার তরফদার অনিকের রুমে ঢুকে দেখলেন অনিক কাগজে কি যেন আঁকছে আর সখিনা কাগজের দিকে তাকিয়ে আছে। ডাক্তার তরফদারকে ঢুকতে দেখে সখিনা বের হয়ে গেল। শিখা রহমান নিজেও সরে এলেন। রুমটাতে এখন শুধু ডাক্তার তরফদার আর অনিক, আর কেউ নেই।

অনিক সালাম দিলে ডাক্তার তরফদার উত্তর দিয়ে বললেন, কেমন আছ অনিক?

জি ভালো আছি।

কী করছ?

একটা ডাইনোসরের ছবি আঁকছি।

ছবিটা তো বেশ সুন্দর হয়েছে।

এখনও রঙ দিতে পারি নি। রঙ দিলে আরও সুন্দর হবে।

হু তাই তো দেখছি। তো তোমার বাবা কেমন আছেন?

অনিক সরু চোখে ডাক্তার তরফদারের দিকে তাকাল। তারপর আবার ডাইনোসরের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বাবা নেই, মারা গেছে।

মারা গেছে! কবে?

অনেক আগে।

আর তোমার মা, তিনি কেমন আছেন?

মা অসুস্থ।

এখনও সুস্থ হননি?

না, তার অসুখ আরও বেড়েছে।

তুমি জানলে কীভাবে?

একা একাই জেনেছি।

ডাক্তার তরফদার একটু সময় নিলেন। তারপর ডাইনোসরের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সত্যি সুন্দর ছবি আঁক। একটা কাজ করতে পারবে?

কী কাজ?

তুমি তোমার মার একটা ছবি আঁক।

কথাটা শোনার পর মুহূর্তের জন্য যেন ধাক্কা খেল অনিক। তারপরই তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আমি তো মানুষের ছবি আঁকতে পারি না। খুব কঠিন।

চেষ্টা করে দ্যাখো। একেবারে হুবহু হওয়ার দরকার নেই, কাছাকাছি হলে হবে। যেমন ধরো চুলটা যেমন হবে ততটুকু থাকবে। লম্বা হলে লম্বা, ছোট হলে ছোট। চোখে চমশা থাকলে চশমা দেবে, না থাকলে নেই। শাড়ী পরলে শাড়ী আঁকবে, এরকম তোমার যা মনে হয়। আর...

আর কী?

আর তোমার মায়ের বাড়ির ছবিটা আঁকবে। তুমি তো বাড়ি আঁকতে পার, তাই না?

হ্যাঁ পারি।

তাহলে চেষ্টা করে দেখো। দেখা যাক কী হয়?

অনিক খুব উৎসাহ নিয়ে বাড়ি আর তার মায়ের ছবি আঁকতে শুরু করল। কাগজের উপর সুন্দর একটা পাটখড়ির ঘর আঁকল সে। বেড়া আঁকার সময় বলল এটা পাটখড়ির বেড়া। তারপর ঘরের একটা বারান্দা আঁকল। এরপর আঁকল উঠোন। সেই উঠোনের চারপাশে কিছু গাছও আঁকল সে। গাছগুলো দেখিয়ে অনিক বলল, এটা হচ্ছে আম গাঁছ, এটা কাঁঠাল গাছ আর এটা হচ্ছে কদবেল গাছ। গ্রামে এই কদবেল গাছ শুধু আমাদের বাড়িতে আছে, আর কোনো বাড়িতে নেই। আর এইপাশে কলা গাছ, তার পাশে একটা বাঁশঝাড়। এখন আমি উঠোনে আমার মাকে আঁকব। আঁকি?

হ্যাঁ আঁক।

অনিক তার মাকে আঁকতে চেষ্টা করল। ছবিটা সুন্দর হল না। শুধু বোঝা গেল মানুষের একটা অবয়ব আছে ছবিটাতে। তবে যে ব্যাপারগুলো বোঝা গেল সেগুলো সত্যি বিস্ময়কর। ছবিতে যে নারীকে আঁকা হয়েছে তার চুল লম্বা, একেবারে কোমর পর্যন্ত। মুখের থুতুনিতে একটা তিল আছে, আর সে শাড়ী পরে। হাতে চুড়ি আকার চেষ্টা করেছে অনিক, কিন্তু ঠিকমতো পারে নি।

পার্থক্যগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারলেন ডাক্তার তরফদার। ছবির নারী আর অনিকের আম্মু শিখা রহমান এক নন। কারণ শিখা রহমানের চুল ঘাড় পর্যন্ত, অনেকটা বব কাট। তিনি শাড়ী পরেন না, সালোয়ার কামিজ পরেন, অথচ ছবির নারী শাড়ী পরে আছে। তাছাড়া শিখা রহমানের মুখে কোনো তিল নেই, অথচ ছবির নারীর থুতুনিতে একটা তিল আছে।

ডাক্তার তরফদার ছবির নারীর চোখ দেখিয়ে বললেন, কই চশমা দিলে না তো?

মা তো চশমা পরে না।

তোমার আম্মু তো পরে।

অনিক খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, আম্মু আর মা এক নয়। তারা আলাদা।

ডাক্তার তরফদার মাথা ঝাকিয়ে বললেন, পার্থক্যটা এখন আমি বুঝতে পেরেছি। এজন্যই বুঝি তুমি তোমার মার কাছে যেতে চাও?

হ্যাঁ চাই।

কিন্তু কীভাবে যাবে? পথ চিনতে হবে। তাছাড়া টাকাও দরকার।

টাকা সমস্যা না, আমার যে মাটির ব্যাংকটা আছে, ঐ যে ওখানে অনেক টাকা জমেছে। ঐ টাকা দিয়ে চলে যাব। তবে পথটাই সমস্যা। পথটা ঠিকমতো চিনি না। যখন চিনব চলে যাব।

না না, একা যাবে না। একা গেলে বিপদে পড়বে।

আমাকে একাই যেতে হবে। কেউ আমাকে নিয়ে যাবে না। আব্বুকে বলেছি, আম্মুকে বলেছি, কেউ রাজি হয় নি। মাকে লেখা আমার একটা চিঠি পাঠাতেই কতদিন লেগে গেল!

প্রয়োজনে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

অনিক চোখ বড় বড় করে বলল, সত্যি!

হ্যাঁ, তবে একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত?

আমাকে তোমাদের বাড়ি এবং তোমার মায়ের আর একটা ছবি এঁকে দিতে হবে। আমি ছবিটা সাথে নিয়ে যাব। যদি এঁকে দাও, তাহলে কথা দিচ্ছি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব।

এটা কোনো শর্ত হলো, আমি এখনই এঁকে দিচ্ছি।

অনিক খুব উৎসাহের সাথে আর একটা ছবি আঁকল। এই ছবিতে ঘর, আশেপাশের গাছপালা এবং অনিকের মা যার নাম কুসুম তার ছবি আরও অনেক সুন্দর হল। ডাক্তার তরফদারের দিকে ছবিটা এগিয়ে দিয়ে অনিক বলল, আমি কবে আমার মায়ের কাছে যেতে পারব?

এই মাসেই।

তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

কেন?

মা খুব অসুস্থ। তার চিকিৎসার প্রয়োজন।

আমাকে এক সপ্তাহ সময় দাও। এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা হবে। ঠিক আছে।

ঠিক আছে।

আজ তাহলে আসি।

মৃদু হেসে ডাক্তার তরফদার অনিকের রুম থেকে বের হয়ে এলেন। তারপর 'সবকিছু পরে জানাবেন' বলে শিখা রহমানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির বাইরে এলেন। তিনি উপলব্দি করলেন বাড়ির বাইরে আসার পরও তার শরীরে একরকম শিহরণ কাজ করছে। এই শিহরনের মূল কারণ অনিকের ছবি। অনিক তাদের গ্রামের বাড়ি আর তার মায়ের যে দুটো ছবি এঁকেছে দুটো ছবিই হুবহু একইরকম। এতটুকু পার্থক্য নেই কোথাও। যদি কাল্পনিক হতো বা বানানো হতো তাহলে হয় আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, কদবেল গাছ, কলা গাছ, বাঁশ ঝাড় এগুলোর যে কোনো একটা পরিবর্তন হয়ে যেত, তা না হলে অন্তত অবস্থান ভিন্ন হতো। পাশাপাশি অনিকের মায়ের শাড়ি, চুল, মুখের তিল এগুলোর পরিবর্তনও হতে পারত। কিন্তু কোনোকিছুরই পরিবর্তন হয়নি। সবকিছু হুবহু একইরকম। আট বছরের একটি ছেলের পক্ষে কল্পনা থেকে পর পর হুবহু দুটো ছবি আঁকা কঠিন। কোথাও না কোথাও অমিল থাকবে। অথচ দুটি ছবিই একইরকম। তারমানে অনিক যা কিছু বলছে তার কোনোকিছু অবাস্তব নয়, কল্পনা নয়; সবই সত্য। কিন্তু কীভাবে সম্ভব! ভাবতে সবকিছুর নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে শুরু করলেন ডাক্তার তরফদার।

১১

তিন দিন পর। ডাক্তার তরফদারের সামনে নাজমুল হাসান বসে আছেন। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তিনি বুঝি দুঃস্বপ্নের সাগরে ডুবে আছেন। ডাক্তার তরফদার প্রথমে কিছু বললেন না। খানিকটা সময় দিলেন নাজমুল হাসানকে স্বাভাবিক হতে। নাজমুল হাসান আজ নিজেই এসেছেন। সম্ভবত তিনি কিছু বলবেন। কী বলতে চাচ্ছেন তিনি তা সম্পূর্ণটাই শুনতে চাচ্ছেন। এজন্য নিজে কোনো কথা বলছেন না।

নাজমুল হাসান লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি?

ডাক্তার তরফদার ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আপনি কী সিগারেট খান? আপনাকে দেখে তো মনে হয় না।

এখন খাই না, তবে ছাত্র জীবনে খেতাম। এখন একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে।

সিগারেট আছে আপনার কাছে?

হ্যাঁ আছে।

সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস নেই, অথচ সাথে সিগারেট রাখছেন, কেন?

আমার ইদানিং খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। এজন্য একটা প্যাকেট কিনেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত খেতে পারিনি।

কেন?

হয়তো ছেড়ে দিতে পেরেছিলাম বলে, শত হলেও অভ্যাসটা খারাপ।

ডাক্তার তরফদার মৃদু হেসে বললেন, আমি আপনার মানসিক শক্তির প্রশংসা করছি। আপনার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, পকেটে সিগারেটের প্যাকেট রাখছেন, অথচ খাচ্ছেন না। কত বড় মানসিক শক্তি থাকলে এটা সম্ভব, জানেন?

সত্যি আমার মানসিক ক্ষমতা প্রবল। কিন্তু এখন আর পারছি না। অনিকের ঘটনাগুলো আমাদের সুখের জীবনটাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার যে সন্তান অসুস্থ থাকলে বাবা চিন্তিত থাকবে, অস্থির থাকবে। নতুন কিছু কী ঘটেছে?

হ্যাঁ।

কী ঘটেছে?

আমি ভয়ংকর একটা অপরাধ করেছি এবং এখন তার শাস্তি পাচ্ছি।

আমাকে খুলে বলুন।

আসলে আমি কিছুতেই অনিকের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিলাম না। দিনে দিনে যখন ওর অবনতি হতে থাকে তখন মনে হলো সমস্যাটা মানসিক না, অন্যকিছু। আমার স্ত্রীরও একই ধারণা জন্মায়। এই অন্যকিছু বলতে আসলে ভূত-প্রেত, জ্বীনকে বুঝাচ্ছি। ব্যাপারটা আপনাকে বলেছিলাম। আপনি আমাদের বলেছিলেন এসবে বিশ্বাস না করতে, সবকিছু ভুলে যেতে। কিন্তু আমরা পারিনি। শেষে আমার অফিসের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী নাম হোসেন, ওকে দায়িত্ব দেই একজন ওঝা কিংবা আধ্যাত্মিক কাউকে খুঁজে বের করার। হোসেন খুঁজে খুঁজে এক পীরকে বের করে। পীরের নাম অনেক বড়, মনে রাখা যায় না। মুখে মুখে তিনি হাবিবি পীর নামেই বেশি পরিচিত। থাকেন উত্তরায়। গত পরশুদিন আমরা ঐ পীরের বাড়িতে যাই। উত্তরায় তিন তলা বিশাল বাড়ি। পুরো বাড়িটা নিয়েই পীর সাহেব থাকেন। পীর সাহেবকে আমরা সবকিছু খুলে বলি। সবকিছু শুনে তিনি দুইঘণ্টা ধ্যানে থাকেন। তারপর যা বললেন তাতে আমার মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা হয়।

কী বলেছেন তিনি?

তিনি বলেছেন অনিক নাকি আমাদের সন্তান না।

কী বলছেন আপনি!

হ্যাঁ এরকমই বলেছেন, অনিক অন্য কারো সন্তান।

আপনি বিশ্বাস করেছেন?

না বিশ্বাস করিনি। আবার ভুলে যেতেও পারছি না, অবিশ্বাসও করতে পারছি না।

কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না? আবার কেন অবিশ্বাস করতে পারছেন না? আমার কাছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করুন।

অবিশ্বাস করতে পারছি না এ কারণে যে অনিক শিখার পেটের সন্তান। অনিকের জন্মের পর আমি নিজে অনিককে প্রথম হাতে তুলে নেই। কী ফুটফুটে সুন্দর চেহারা! সেই অনিককেই আমরা লালন পালন করে বড় করেছি। অথচ ও আমাদের সন্তান হবে না। সেটা কী হয়?

আর পীর সাহেবের কথা বিশ্বাসের কারণ?

পীর সাহেব আমাকে মিথ্যা বলতে যাবেন কেন? তার স্বার্থ কী এতে? তাছাড়া তার বেশ সুনাম আছে। তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না।

ডাক্তার তরফদার কিছু বললেন না। একদৃষ্টিতে শুধু নাজমুল হাসানের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

নাজমুল হাসান খানিকটা বিব্রতভঙ্গিতে বললেন, আগে সমস্যাটা ছিল শুধু অনিককে নিয়ে। এখন সমস্যা শুরু হয়েছে শিখাকে নিয়ে। ও বলতে গেলে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। কেন যেন মনে হচ্ছে পীরের ওখান থেকে ফিরে আসার পর অনিকের প্রতি ওর আগ্রহও কমে গেছে। আমিও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না।

কিন্তু আপনারা জানেন অনিক আপনাদের ছেলে।

হ্যাঁ জানি।

তাহলে পীরের কথা আপনারা বিশ্বাস করছেন কেন? কী এমন রহস্য আছে যা আপনাদের পীরের কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে?

নাজমুল হাসান কোনো কথা বললেন না। চুপ থাকলেন।

আপনি কিছু বলছেন না কেন?

আসলে আমার বলার কিছু নেই। আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি অনিক আমার ছেলে, আমাদের ছেলে।

তাহলে আপনি বাসায় চলে যান এবং নিশ্চিন্তে থাকুন। পীরের কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই।

কি..কিন্তু...

কোনো কিন্তু নয়। অনিককে সুস্থ করার জন্য যা যা পরামর্শ দিয়েছি সেগুলো করুন। তা না হলে অনিকের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

নাজমুল হাসান উঠে দাঁড়ালে ডাক্তার তরফদার বললেন, আপনার কাছে যে সিগারেটের প্যাকেটটা আছে সেটা ফেলে দিন।

নাজমুল হাসান ইতস্তত করতে ডাক্তার তরফদার আবার বললেন, ঐ সিগারেটের প্যাকেট যতক্ষণ আপনার কাছে থাকবে ততক্ষণ আপনি সিদ্ধান্তহীনতা এবং অস্থিরতায় ভুগবেন। একবার মনে হবে সিগারেট খাবেন, আবার মনে হবে খাবেন না। কেন শুধু শুধু অতিরিক্ত টেনশনে ভুগবেন? খারাপ একটা জিনিসকে ডাস্টবিনে জায়গা দিন, আপনার মুখে নয়।

নাজমুল হাসান সিগারেটের প্যাকেটটা টেবিলের উপর রাখলেন। তিনি যখন বের হয়ে যাবেন তখন ডাক্তার তরফদার পিছন থেকে বললেন, নাজমুল সাহেব, অনিকের, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর কিছু প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করতে দিয়েছিলাম। ওগুলো কী করেছেন?

হ্যাঁ করেছি, কিন্তু রিপোর্ট এখনও আনিনি।

রিপোর্টগুলো সংগ্রহ করে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। রিপোর্টগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ।

জি নিয়ে আসব।

একটু থেমে নাজমুল হাসান বললেন, আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

হ্যাঁ পারেন।

পৃথিবীতে এমন কী কোনো মানুষ আছে যে সত্যি অলৌকিকভাবে কোনোকিছু জানতে পারে?

আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

আমি আসলে পীরের ব্যাপারটা মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না।

ডাক্তার তরফদার এবার চেয়ার থেকে উঠে এসে বললেন, আছে এবং তাদের এইসব অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাখা নেই। তবে এটা সত্য আপনার পীর কোনো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নন। কাজেই তার চিন্তাটা মাথা থেকে বাদ দিয়ে দিন।

তাহলে পীর ওরকম বলবেন কেন?

হাবিবি পীর সম্ভবত অনুমানভিত্তিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন।

কী রকম?

আমার ব্যাখ্যাটা এরকম, আপনার নাম নাজমুল হাসান এবং আপনার স্ত্রীর নাম শিখা রহমান। দুজনের নামের কোথাও কোনো মিল নেই। আমাদের দেশের রীতি অনুসারে বিয়ের পর স্ত্রীর নামের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর নামের কিছু অংশ যুক্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীর নাম হওয়া উচিত ছিল শিখা হাসান কিংবা শিখা নাজমুল কিংবা মিসেস নাজমুল, অথবা এরকম কিছু। পীর হাবিবি ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন এবং ধরে নিয়েছেন আপনাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা দূরত্ব আছে। এই দূরত্বের সাথে তিনি অনিকের অসুস্থতার ব্যাপারটা জড়াতে চেয়েছেন।

সত্যি কথা বলতে কী আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই।

আমি সেটা জানি। কিন্তু পীর হাবিবি সেটা জানেন না। জানেন না বলেই তিনি আপনাকে বিভ্রান্ত করছেন। আমার অনুরোধ আপনি বিভ্রান্ত হবেন না। সরাসরি বাসায় চলে যান, তারপর সবাই মিলে বাইরে কোথাও গিয়ে আজকের দিনটা কাটিয়ে দিন। ঢাকার আশেপাশে অনেক রিসর্ট আছে। রিসর্টগুলোতে গেলে দেখবেন ভালো লাগবে। আর হ্যাঁ, অনিক যে আপনার নিজের ছেলে সেই প্রমাণ আমার কাছে আছে। যেখানে আপনাদের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন, সেখানে আপনাদের অজান্তে আমি একটি টেস্ট করিয়েছি, সেটা হল ডিএনএ টেস্ট। ঐ টেস্টে স্পষ্ট দেখা গেছে আপনি এবং আপনার স্ত্রীর সাথে অনিকের ডিএনএর মিল রয়েছে। অর্থাৎ অনিক আপনাদের সন্তান। কাজেই অনিক আপনার কিংবা আপনাদের সন্তান কিনা এ বিষয়ে আর চিন্তা করবেন না।

নাজমুল হাসান হাঁ করে কিছুক্ষণ ডাক্তার তরফদারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর কোনো কথা না বলেই বের হয়ে এলেন।

১২

রাত এগারোটা বাজে। ডাক্তার তরফদার সারাটাদিন আজ অনিকের সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন। সমস্যাটা বেশ গুরুতর বলেই তিনি অনুধাবন করছেন। তবে সমাধানটা খুব কঠিন বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু সমাধানের পথটা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, এজন্যই সমাধানটা তিনি করতে পারছেন না।

এরকম পরিস্থিতিতে তিনি বার বার সমাধানের উপায় নিয়ে ভাবতে থাকেন। আজ সারাদিন সেরকমই ভেবেছেন। এখন পর্যন্ত কোনো উপায় বের করতে না পেরে আবার সবকিছু নতুনভাবে ভাবতে এবং বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন।

সমস্যার কেন্দ্র অনিক নামের একটি ছেলে। অনিকের বয়স আট বছর। ক্লাস টুতে পড়ে। বাবা নাজমুল হাসান, মা শিখা রহমান। দুজনেই খুব ভালো, শিক্ষিত এবং মার্জিত। তাদের বিয়ে হয়েছে আঠার বছর। প্রথম দশ বছর তাদের কোনো সন্তান ছিল না। বিয়ের দশ বছর পর অনিক জন্মগ্রহণ করে এবং অনিক মোটামুটি সুস্থই ছিল। কিন্তু কিছুদিন হল অনিক বলছে নাজমুল হাসান এবং শিখা

রহমান তার বাবা মা নয়। তারা তার আব্বু আম্মু। তার বাবা মা হল, হরুনুর রশিদ এবং কুসুম। বাড়ির ঠিকানা, গ্রাম - ইদ্রা, থানা - শিমুলতলী, জেলা - ফরিদপুর। অনিক বলেছে তার বাবা হারুনুর রশিদ বেঁচে নেই এবং মা কুসুম খুব অসুস্থ। অনিকের মধ্যে আচরণগত যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলো হল,

১. অনিক তার মায়ের সাথে একা একা কথা বলে।
২. অনিক তার মায়ের কাছে চিঠি লেখে।
৩. অনিক রাতের বেলা একা একা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।
৪. অনিক নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমানকে আব্বু আম্মু বললেও মা বাবা বলে স্বীকার করছে না।
৫. অনিক তার গ্রামের বাড়ির ছবি আঁকতে পছন্দ করে।
৬. অনিক তার মা বাবাকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। সে তার মাকে দেখতে যাবে বলেছে।
৭. অনিক রাতের বৃষ্টি আর জোছনা দেখতে পছন্দ করে। সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে বৃষ্টি ভেজা জোছনা দেখতে।

অনিকের উপরোক্ত আচরণগুলো নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমানের সংসারে অশান্তি এবং অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। তারা এখন ঠিকমতো অনিকের প্রতি নজর রাখছেন না। এটা ভয়ংকর ব্যাপার। এরকম চলতে থাকলে অনিককে সুস্থ করে তোলা কঠিন হয়ে পড়বে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনিকের মধ্যে মানসিক এবং আচরণগত কেন এই পরিবর্তন?

ডাক্তার তরফদার ভেবে দেখলেন, বেশ কয়েকটা কারণে এরকম ঘটতে পারে। প্রথম কারণটা হতে পারে পারিপার্শ্বিক প্রভাব। আশোপাশের কেউ তাকে এরকম আচরণ করতে বলছে এবং সে সেটা করছে। শিশুরা এরকম করে। অনিকও করতে পারে। কিন্তু কে সে? তার পাশেপাশে এমন কেউ নেই যে তাকে এরকম আচরণ করতে প্ররোচিত করতে পারে, প্রভাবিত করতে পারে। বাড়ির আগের কাজের বুয়া হাসিনার এরকম করার কথা নয়। কারণ সে তাকে বড় করেছে। নতুন কাজের মেয়ে সখিনাও করবে না। কারণ তাতে তার লাভ কী? কোনো লাভ নেই। আর্থিক বা বড় ধরনের সুবিধার আশা ছাড়া কেউ এ ধরনের ঝুকি নেবে না। আর যদি নিয়েও থাকে তা এতদিন ধরে থাকার কথা নয়। কাজেই পারিপার্শ্বিক প্রভাবের এই ব্যাখ্যাটা বাদ দেয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটার নাম হতে পারে দত্তক ব্যাখ্যা। নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমানের দশ বছর ধরে কোনো সন্তান হয়নি। তারা সন্তান পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। যখন নিশ্চিত হয়েছেন তাদের সন্তান হবে না তখন তারা তিন কিংবা চার বছর বয়সী অনিককে দত্তক নিয়েছেন এবং অনিকের পূর্বের নামটা পালটে ফেলেছেন। হয়তো অনিকের আসল বাবা ছিল হারুনুর রশিদ এবং মা কুসম। সেই স্মৃতিটা অনিকের মাথায় ঠিকই রয়েছে। এখন আট বছর বয়সে সেই স্মৃতি থেকে সে কিছু কিছু বিষয় ব্যক্ত করতে পারছে, সামনে হয়তো আরও অনেককিছু ব্যক্ত করবে। এমনও হতে পারে তার আসল নামটা বলতে পারছে। তখন জটিলতা আর বাড়ব। তবে এই ব্যাখ্যাটাও গ্রহণ করার মতো নয়। কারণ অনিকের জন্ম হয়েছে ক্লিনিকে এবং সবাই সেটা দেখেছে। সবচেয়ে বড় সাক্ষী হাসিনা বুয়া নিজে। সে নিজের হাতে অনিককে লালন পালন করেছে। নাজমুল হাসান কিংবা শিখা রহমান কিছু গোপন করলেও হাসিনা বুয়া যে করেনি সেটা নিশ্চিত।

তৃতীয় ব্যাখ্যাটা হতে পার 'পরিবর্তন' ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সিটি ক্লিনিকে যখন শিখা রহমানের বাচ্চা হয় তখন ইনকিউবেশন রুমে বাচ্চাটি অন্য বাচ্চার সাথে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে অনিক হয়তো তার আসল বাবা মার নাম মনে করতে পারছে। কিন্তু কীভাবে এটা সম্ভব? হতে পারে।

বাচ্চা যখন মায়ের পেটের মধ্যে থাকে তখন বাবা মার অনেক কথা শব্দরূপে সে শুনতে পায়। সেগুলো মস্তিষ্কের মধ্যে থেকে যায়। এজন্য জন্মগ্রহণ করার পর অনেক বাচ্চা বাবা মার গলা শুনলে বুঝতে পারে তারা তার আপনজন। কারণ পেটের মধ্যে থাকতে তাদের কথাই সে বেশি শুনে। গর্ভাবস্থায় মস্তিস্কে যে সকল শব্দ থাকে সেগুলোর কিছু হয়তো এতদিন পর অনিক উপলব্দি করছে এবং বলছে। এই ব্যাখ্যাটাও শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারলেন না ডাক্তার তরফদার। কারণ ক্লিনিকে যেভাবে বাচ্চাদের রাখা হয় সেখান থেকে বাচ্চা পরিবর্তন দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া বাচ্চার স্মৃতিতে বাবা মায়ের নাম এবং বাড়ির ঠিকানা থাকারও নিশ্চিত বৈজ্ঞানীক ব্যাখ্যা নেই। আর থাকলেও বাড়ির ছবি কীভাবে আঁকবে সেই প্রশ্নেরও কোনো সমাধান নেই। তাছাড়া সবচেয়ে বড় প্রমাণ ডিএনএ টেস্ট। সেখানে নিশ্চত হওয়া গেছে অনিক নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমানেরই সন্তান। কাজেই ব্যাখাটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে ডাক্তার তরফদার চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই তার মনঃপূত হচ্ছে না। কুসুম এবং হারুনুর রশিদ, অনিকের নতুন এই মা বাবার নাম বলা ছাড়া আর একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো রাতের বৃষ্টি এবং জোছনা দেখা। বৃষ্টি এবং জোছনা দুটোই সুন্দর। এরকম সুন্দর দুটো জিনিসকে অনিক আরও সুন্দর করে তুলেছে 'বৃষ্টি ভেজা জোছনা' এভাবে শব্দগুলো সাজিয়ে। ডাক্তার তরফদার মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি কখনও বৃষ্টি ভেজা জোছনা দেখেছেন কিনা। শেষ পর্যন্ত মনে করতে পারলেন না। পারলেন না বলেই তার মনে প্রশ্ন উঠল, অনিক কীভাবে 'বৃষ্টি ভেজা জোছনা' দেখল? অনিকের আচরণে এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবচেতন মনের ব্যাখাকেই সত্য বলে ধরে নিতে হবে। এই ব্যাখাটা চতুর্থ ব্যাখ্যা এবং নাম হতে পারে অবচেতন মনের ব্যাখ্যা। অনিক তার দিনের অধিকাংশ সময় একা কাটায়। বাবা মায়ের পরিপূর্ণ ভালোবাসা সে পায় না। কিন্তু তার খুব ইচ্ছে সে তার বাবা মায়ের ভালোবাসা পাবে। এজন্য সে তার অবচেতন মনে একটা ভালোলাগার জগত সৃষ্টি করে নিয়েছে যেখানে তার কুসুম নামের একজন মা আছে। বাবার নাম হারুনুর রশিদ, কিন্তু সে মৃত। অবচেতন মনের ঐ জগতে তাদের বাড়িটা গ্রামে এবং সেখানেই তারা থাকে। মায়ের সাথে সে ঘুরে বেড়ায়, খেলাধূলা করে, ফসলের মাঠে ছুটে বেড়ায়, বৃষ্টি দেখে, জোছনা দেখে - সবকিছু করে। কুসুম নামক মায়ের ঐ কল্পনার ভালোবাসার জগতটা তার বড় ভালোলাগার। এজন্য সে নিজেই বার বার ঐ জাগতটায় ফিরে যায় এবং আনন্দ লাভ করে। মানুষের সচেতন মনকে পিছনে ফেলে অবচেতন মনের এরকম প্রকট হওয়া বা উঠে আসাকে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণ করা যায়। কারণ এরকম একটা অসুখের নাম সিজোফ্রেনিয়া। সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত এক প্রকার রুগীরা নিজের সৃষ্ট কল্পনার জগতে থাকতে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার রুগীরা সবসময় কল্পনার জগতে থাকে না। এজন্য যখন তারা সচেতন বা বাস্তব জগতে থাকে তখন তারা বাস্তবসম্মতভাবেই কথা বলে। কিন্তু অনিকের ক্ষেত্রে সেরকম হচ্ছে না। তাকে যখনই তার মায়ের নাম জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তখনই সে বলছে 'কুসুম'। এরকম হওয়ার কথা নয়। সে যদি সবসময় অবচেতন মনের জগতে থাকত তাহলে এই ব্যাখ্যাটা গ্রহণযোগ্য হতো। সে সচেতন বা বাস্তব জগতে থেকে অবচেতন মনের কল্পনার জগতের তথ্য প্রদান করছে - এটা হতে পারে না। একইসাথে একজন মানুষ সচেতন এবং অবচেতন দুই জগতে থাকতে পারে না এবং দুটো কল্পনা একসাথে করতে পারে না। সেক্ষেত্রে অনিক সচেতন এবং অবচেতন মনের মিশ্রন ঘটাচ্ছে কীভাবে? একই সময়ে সচেতন এবং অবচেতন মনের পাশাপাশি অবস্থান বা সংমিশ্রন অবাস্তব হলেও সেটা অনিকের ক্ষেত্রে ঘটছে। এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য একটা বিষয়। এজন্য অবচেতন মনের কল্পনার জগত সৃষ্টির ব্যাখ্যাটাও মানানসই নয়। তাহলে অনিকের আচরণের ব্যখা কী?

প্রশ্নটা নিজেকে করে ডাক্তার তরফদার নিজেই উত্তর খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু উত্তর তিনি পেলেন না। ঠিক করলেন, এতদিন তিনি সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য সবসময় অনিককে কেন্দ্র করে চিন্তা ভাবনা করেছেন। এবার ঠিক করলেন তিনি কেন্দ্র অর্থাৎ অনিককে বাদ দিয়ে সমস্যার পরিধি থেকে শুরু করবেন। পরিধিতে যে সকল চরিত্র আছে তার মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় হল কুসুম। এই কুসুমকে তিনি খুঁজে বের করবেন, তা যেভাবেই হোক না কেন। তিনি সেটা পারবেন কারণ তার কাছে কুসুমের ঠিকানা আছে। ঐ ঠিকানায় তিনি যাবেন এবং দেখবেন আসলে কুসুম নামে আদৌ সেখানে কেউ আছে কিনা।

১৩

ডাক্তার তরফদার বেশ সকালে ফরিদপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। এজন্য ন'টার আগেই তিনি শিমুলতলীতে পৌঁছে গেলেন। ইদ্রা গ্রাম সম্পর্কে তিনি আগেই জেনে এসেছেন। ঢাকা থেকে শিমুলতলী থানায় ফোন করলে থানা থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে ইদ্রা নামের একটা গ্রাম আছে। শিমুলতলীর এক দোকানদারের কাছ থেকে ইদ্রা গ্রামে যাওয়ার পথটা তিনি জেনে নিলেন। কিছুটা পথ ভ্যানে যেতে পারলেও এরপর তাকে পাঁয়ে হেটে যেতে হচ্ছে। একেবারে মাটির পথ।

ডাক্তার তরফদারকে দেখে অনেকে নিজে থেকে এসে জিজ্ঞেস করে জানতে চাচ্ছে তিনি কোথায় যাবেন। ইদ্রা গ্রামের নাম বলতে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে তারা। এজন্য পথ চিনে এগোতে সমস্যা হচ্ছে না।

ডাক্তার তরফদার ইদ্রা গ্রামে যখন প্রবেশ করলেন তখন সময় সোয়া এগারোটা। গ্রামের একটা মাঠে এসে পৌঁছেছেন তিনি। অনেকদূর হাঁটায় হাঁপিয়ে উঠেছেন। মাঠের পাশে একটা চায়ের দোকান দেখে সেখানে গিয়ে বসলেন। চা বিক্রেতা বারো তের বছরের অল্পবসয়ী এক ছেলে। ডাক্তার তরফদারকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, চা খাবেন স্যার?

হ্যাঁ।

দুধ চা না লাল চা।

দুধ চা।

ছেলেটি চা বানাতে শুরু করলে ডাক্তার তরফদার বললেন, কী নাম তোমার?

মিলন স্যার।

মিলন, তেমাদের এই গ্রামের নাম তো ইদ্রা, তাই না?

হঁ স্যার।

এই গ্রামে কুসুম নামে কেউ আছে?

কুসুম!

হ্যাঁ, তার স্বামীর নাম হারুনুর রশিদ।

কুসুম নামের দুইজনরে আমি চিনি। একজনের বয়স ছয় সাত বছর হবে, ছোট্ট। আর একজনের বিয়া হইছে, কিন্তু তার স্বামীর নাম হারুনুর রশিদ না, কবির মাতুব্বর।

কথা বলতে বলতে মিলনের চা বানানো শেষ হয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ডাক্তার তরফদার বললেন, কবির মাতুব্বরের ছেলে মেয়ে কয়জন?

দুই ছেলে এক মেয়ে।

তুমি কি আমাকে ঐ বাড়িতে একটু নিয়ে যাবে?

ক্যান স্যার?

মনে হয় তার কাছ থেকে আমি কুসুম নামের অন্য কেউ থাকলে তার সম্পর্কে জানতে পারব। কারণ গ্রামে একই নামের সবই একজন অন্যজনকে ভালোমতো চেনে।

আমি সবই জানি স্যার। এই গ্রামের সবার নাম আমার জানা।

তারপরও আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।

আমি আপনেরে নিয়া যাবার পারি। কিন্তু যদি হে কথা না কয়?

তার স্বামী কবির মাতুব্বরের সাথে কথা বলব। আমার বিশ্বাস তার কাছ থেকে আমি প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাব। কবির মাতুব্বর তো এই গ্রামেরই মানুষ, তাই না?

হঁ।

তাহলে তুমি আমাকে তার কাছে নিয়া যাও।

চা শ্যাষ করেন, নিয়া যাইতেছি।

ডাক্তার তরফদার চা শেষ করে কবির মাতুব্বরের বাড়ি এলেন। কবির মাতুব্বর মানুষটা মধ্যবয়সী এবং ভালো। ডাক্তার তরফদার ঢাকা থেকে এসেছেন শুনে তাকে গাছ থেকে পেড়ে ডাবের পানিও খওয়াল। গ্রামে এরকম আন্তরিক মানুষ এখন সাধারণত দেখা যায় না।

কবির মাতুব্বর ডাক্তার তরফদারকে হতাশ করল। কুসুম নামের নতুন কারো সন্ধান সে দিতে পারল না। ডাক্তার তরফদার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবিকিছু মিলে গিয়েও যেন মিলছে না। শেষে তিনি তার হাতের ফাইলের মধ্যে থেকে অনিকের আকা বাড়ির ছবিটা বের করলেন। সেই ছবিটা বের করে ব্যাখ্যা করার সময় যখন কদবেল গাছের কথা বললেন তখন কবির মাতুব্বর সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, এই গ্রামে মাত্র একটা বাড়িতে কদবেল গাছ আছে।

ডাক্তার তরফদার সংকুচিত চোখে বললেন, মাত্র একটা বাড়িতে?

হঁ, ঐডা কুলসুমগো বাড়ি।

কুলসুম!

হঁ, কুলসুম। আপনে ঠিকই বলছেন, কুলসুমের স্বামীর নাম আছিল হারুনুর রশিদ।

কথাগুলো শোনামাত্র ডাক্তার তরফদারের শরীরের লোমগুলো সব দাঁড়িয়ে গেল। তিনি বললেন, হারুনুর রশিদ কোথায়?

হে তো মারা গেছে, অনেক আগে। তা প্রায় পনের ষোল বছর হবে।

মারা গেছে!

হঁ, আসলে হরুনুর রশিদ আছিল বাউল। গ্রামে গঞ্জে ঘুইরা বেড়াইত আর গান গাইত। জীবনডা আছিল ছন্নছাড়ার মতো। এইজন্য বাড়িডারে আমরা বাউলের বাড়ি কই। গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে হারুনুর রশিদের আলসার হইয়া গেছিল। এই যুগে বাউলরে কে খাবার দেয় বলেন? না খাইয়া থাকতে থাকতে ঐ আলসার হইছিল, আলসারে ভুইগাই হে মারা গেছে। শ্যাষ সময়ে কাশের সাথে রক্ত পড়ত। গ্রামের সবাই চান্দা তুইলা চিকিৎসাও করছিল। কিন্তু লাভ হয় নাই।

তার ছেলে মেয়ে?

এক ছেলে আছিল, কী যেন নাম। হঁ মনে পড়ছে, বকুল।

বকুল, বকুলের কী হয়েছে?

বকুলও মারা গেছে!

মারা গেছে!

হু। তা প্রায় আট বছর হবে। তারপরতে কুলসুম পাগলের মতো হইয়া গেছে। বাউলের বাড়িরে কেউ কেউ এহন পাগলের বাড়িও কয়। আপনি যে ছবিডা দেখায়ছেন ঐ ছবির সাথে ঐ বাড়ির সবকিছু হুবহু মিলা গেছে। বাউল হারুনুর রশিদ বয়সে আমাগো চাইতে একটু বড় আছিল। আমরা

তারে হরুন ভাই কইতাম। ঐ সময় আমরা তার বাড়িতে নিয়মিত আসর বসাইতাম। বিশেষ কইরা চাঁদনী রাইতে।

চাঁদনী রাইতে!

হু চাঁদনী রাইতে। ভালো আসর জমত। হারুন ভাই ভালো গান গাইত। তার দোতারার বাজানাই আছিল অন্যরকম। চাঁদনী রাইত আছিল তার সবচাইতে প্রিয়। ঐ রাইতে হে পাগলের মতো দোতারা বাজাইত আর গান গাইত। তার আরও দুইজন সাগরেদ আছিল। একজন কুদ্দুছ, হে গ্রাম ছাইড়া চইলা গেছে। আর একজন মাসুম শিকদার, আমার বয়সী হবে। হে গ্রামে আছে।

আমি কী মাসুম শিকদারের সাথে কথা বলতে পারব?

অবশ্যই পারবেন। আপনে বললেন আমি তারে ডাইকা নিয়া আসব।

তাহলে আমার সাথে একটু কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন।

আইচ্ছা।

ডক্তার তরফদার অনুধাবন করলেন, উত্তেজনায় তার শরীর ধীরে ধীরে কাঁপতে শুরু করেছে। তিনি বললেন, কুলসুম এখন কোথায় থাকে?

নিজের বাড়িতেই থাকে। বাইরা বাইর হবার পারে না। অবস্থা খুব খারাপ।

অবস্থা খারাপ মানে?

ওর লিভারে কী যেন অসুখ হইছে। গ্রামের ডাক্তার বলছে লিভার সিরোসিস। বেশিদিন নাকি বাঁচবে না।

কী বলছেন!

হঁ। আগে তো এই বাড়িতে ঐ বাড়িতে কাম-কাইজ করবার পারত। এহন তাও পারে না। সারাদিন ঘরে শুইয়া থাকে। মেলাদিন দেহি না। মনে হয় বাইরা আসে না।

তাহলে জীবন চালায় কীভাবে?

যে বাড়িগুলাতে কাম-কাইজ করত হেই বাড়িগুলা থাইকা মাঝে মইধ্যে খাবার পাঠায়। হেইগুলি খাইয়া থাকে, নইলে না খাইয়া থাকে। আসলে তার অবস্থা এত খারাপ যে কিছু খাবার পারে না। দ্যাখলে বুঝবার পারবেন।

কুলসুমের বাড়ি কোনদিক দিয়ে যেতে হবে?

আমি আপনেরে নিয়া যাইতেছি, চলেন।

কথাটা বলে কবির মাতুব্বর হাঁটতে শুরু করল। ডাক্তার তরফদার তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন, বকুল কবে মারা গেছে বলতে পারবেন? তারিখটা জানতে চাচ্ছি।

কবির মাতুব্বর খানিকটা চিন্তা করে হিসাব মেলানোর চেষ্টা করল। তারপর বললেন, আমার ভুল হবার পারে। তয় যতদূর মনে পড়ে আট বছর আগে কোনো এক ইংরেজি মাসের শ্যাষ তারিখে। তারিখটা মনে আছে এই কারণে যে একদিন আগে আমার বড় ছেলের জন্ম হইছিল। তার পরদিন বকুল মারা যায়।

সময় মনে আছে?

সকাল সাড়ে এগারোটার মতো হবে।

ডাক্তার তরফদার মনে মনে একটা হিসাব করে ফেললেনে। যা পেলেন তাতে তার আঁতকে উঠার মতো অবস্থা হলো। অনিকের জন্ম তারিখ ত্রিশ জুন, জন্মের সময় এগারোটা। কবির মাতুব্বর আট বছর পর একেবারে সঠিক হিসাব করতে পারেনি বলে সময়টা মিলেনি। সিটি ক্লিনিকে শিখা রহমানের সিজার অপারেশন রিপোর্টে অনিকের জন্ম এগারোটা লেখা হয়ছে। তার মানে বকুলের মৃত্যুর সাথে সাথে অনিকের জন্ম হয়েছে। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বকুলের মৃত্যু এবং অনিকের জন্মের মাঝে প্রকৃতি এক বিশেষ যোগসূত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে।

এরকম ভাবতে ডাক্তার তরফদারের সমস্ত শরীরে একরকম শির শির অনুভূতির সৃষ্টি হল। তিনি শরীরটা জোরে ঝাকি দিয়ে কবির মাতুব্বরকে অনুসরণ করতে লাগলেন। যত দ্রুত সম্ভব তিনি কুলসুমের সাথে দেখা করতে চান।

১৪

ডাক্তার তরফদার কুলসুমের বাড়িতে এসে থমকে গেলেন। বাড়িটা হুবহু অনিকের আঁকা ছবির মতো। ছবিতে ঘরটা যেমন ছিল এই বাড়ির ঘরটাও সেরকম, সেই আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, কলা গাছ, কদবেল গাছ সব আছে। আছে বাঁশ ঝাড়ও। তিনি ভেবে পেলেন না অনিক কীভাবে এতসবকিছু জানল। যদি অনিক আগে কখনও এখানে না এসে থাকে তাহলে তার পক্ষে কোনোদিনও জানা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি নিশ্চিত অনিক তার আট বছরের জীবনে কোনোদিন এই বাড়ি কিংবা এই গ্রামে আসেনি। সেক্ষেত্রে অনিকের এই বাড়ি সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারার ঘটনা সত্যি বিরাট এক রহস্য।

কবির মাতুব্বর ঘরের ভিতর গিয়ে কুলসুমের অনুমতি নিয়ে এলে ডাক্তার তরফদার ভিতরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন ভিতরে শ্যামলাবর্ণের এক মহিলা একটা চকিতে শুয়ে আছে। এই মহিলাই যে কুলসুম বুঝতে অসুবিধা হল না তার। চকির উপরে শুধু একটা খেজুর পাতার মাদুর পাতা। মাথার নিচের বালিশটা এত পুরাতন যে রঙ বোঝা যাচ্ছে না।

কুলসুমের শরীরটা একেবারে হাড্ডিসার হয়ে আছে। চোখ দুটো বেশ ভিতরে ঢুকে গেছে। কপালে ভাজ পড়েছে। মারাত্মক অসুস্থ না হলে মানুষের চেহারা এরকম হয় না। তারপরও কুলসুমের চেহারার কোথায় যেন একরকম মাধুর্যতা আছে। বোঝা যাচ্ছে একসময় তার চেহারা খুব মিষ্টি ছিল।

ডাক্তার তরফদার চৌকির পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ডাক্তার তরফদার, আপনার কাছে বিশেষ একটা কারণে এসেছি।

কুলসুম বিড় বিড় করে সালাম দিয়ে বলল, কি কাম?

ডাক্তার তরফদার কীভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না। কেন যেন তিনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছেন। মনে হচ্ছে তার চোখে পানি এসে যাবে। অনেক কষ্টে নিজের আবেগকে সংবরণ করলেন তিনি। তারপর কুলসুমের মাথার পাশে একটা চিঠির খাম দেখিয়ে বললেন, চিঠিটা আপনাকে কে পাঠিয়েছে?

অনিক নামের এক ছেলে।

অনিক কে?

আমি জানি না। তয় হে চিঠিতে আমারে 'মা' বইলা লিখছে। কিন্তু আমার কোনো সন্তান নাই। একজন আছিল বকুল, হে আট বছর আগে মইরা গেছে।

কীভাবে মারা গেছে?

আমরা আম কুড়াইতে গেছিলাম। তারপর...

তারপর কী?

কুলসুম কিছু বলতে পারল না। ডুকরে কেঁদে উঠল।

ডাক্তার তরফদার কুলসুমকে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিলেন। তারপর বললেন, আপনার শরীর খুব খারাপ। কী হয়েছে আপনার?

আমার লিভার নষ্ট হইয়া গেছে। ডাক্তার বলছে বাঁচব না, এই কয়দিন যে বাঁইচা আছি তাই অনেক। শুধু বাঁইচা আছি বকুলের জন্য।

বুকুল না মারা গেছে বললেন?

হঁ মইরা গেছে, তয় মইরা যাওয়ার আগে বইলা গেছে ও একবার আসবে।

কী বলছেন আপনি!

হঁ, আমি অপেক্ষায় আছি। আমার বুকুল আসবে, ও আইসাই আমারে ওর কাছে নিয়া যাবে।

কথাগুলো বলে আবার কেঁদে উঠল কুলসুম।

ডাক্তার তরফদার বললেন, আমার মনে হয় আপনার চিকিৎসা দরকার। আমি আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাই। সেখানে কয়েকদিন থাকলে আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

হঠাৎই কাশতে শুরু করল কুলসুম। কাশি যেন আর থামে না। একটু কমলে বলল, না আমি যাব না, এই বড়ির বাইরা আমি এক রাইতও থাকব না।

কেন?

বুকল আইসা ফিরা যাবে। আমি ঐ কষ্ট সহ্য করবার পারব না। মৃত্যুডাও আমার শান্তিতে হবে না। ও আমারে মেলা ভালোবাসে, মেলা ভালোবাসে।

বকুল আপনাকে ভালোবাসবে এটাই স্বাভাবিক। ও ছিল আপনার সন্তান।

শুধু সন্তান না, অনেক বড় সন্তান। আমারে মেলা ভালোবাসত। একবার কী হইছিল জানেন, ওর খুব অসুখ হইল, কী অসুখ জানি না। জ্বর আর জ্বর, কিছুতেই যায়না। আমার কোনো টাকা পয়সা আছিল না যে ওরে চিকিৎসা করাব! সহায় সম্বল বলতে হাতে শুধু দুইডা রূপার চুড়ি আছিল। যহন সিদ্ধান্ত নিলাম, চুরি দুইডা বেইচা দিব তহন ও বেঁচবার দিল না। জ্বরের মইধ্যে ও ক্যামনে জানি উইঠা যাইয়া লুকায় রাখল। কোথায় যে রাখল জানবার পারি নাই। এহনও জানি না। নিজে জ্বরে ছফট করলেও আমার রূপার চুড়ি বেঁচবার দেয় নাই। অতটুকু মানুষ, কত কিছু বুঝত! আমারে ছাড়া একটুও থাকত না। আহারে!

কথা বলতে বলতে ডাক্তার তরফদার কুলসুমের নাড়ী পরীক্ষা করলেন। হৃদস্পন্দন অনেক কম। বুঝলেন কুলসুম খুব অসুস্থ। এতটা অসুস্থতা নিয়ে একজন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা সম্ভব না। কুলসুমের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। মাঝে মাঝে কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। একটু পর পর হাঁপিয়ে উঠছে আর ক্রামগত কাঁশছে। সম্ভবত তার হাঁপানিও আছে। তবে সে কথা বলতে চাচ্ছে। বিশেষ করে বকুলকে নিয়ে। এজন্য ঘুরে ফিরে সে বকুলের প্রসঙ্গে ফিরে আসছে।

ডাক্তার তরফদার বললেন, আপনার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে বকুল সবসময় আপনার সাথেই থাকত।

হঁ সবসময় আমার সাথেই থাকত। ওর মতো পোলাপানরা কতকিছু খেলে। কিন্তু ওর সেইদিকে কোনো আগ্রহ আছিল না। আমার সাথ থাকবার পারলেই যেন তার শান্তি আছিল।

আপনারা তো এই বাড়িতেই থাকতেন?

হঁ।

এই বাড়িটা আসলে কার?

বকুলের বাপের। এই ভিটামাটিটুকুই আছে।

আপনাদের বাড়ি কোথায়?

আমাগো বাড়ি কুষ্টিয়া। আমার বাপেও বাউল আছিল। তার কাছে বকুলের বাপ তালিম নিছিল। তারপর হে আমারে বিয়া কইরা এইহানে নিয়া আইছে। বাপজানের মৃত্যুর সময় একবার কুষ্টিয়া গেছিলাম।

আর যান নি কেন?

ঐহানে আমাগো কিছু নাই। মায়ে মরছে অনেক আগে। তাই আর যাই নাই। এই বাড়িতে পইড়া আছি। বকুল আসবে, ও আসবে, আমি ওর অপেক্ষায় আছি। এতদিন বাঁইচা ছিলাম খালি ওর একটা ছবি নিয়া, আর এহন ও আসবে, নিজে আসবে।

ডাক্তার তরফদার ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আপনার কাছে বকুলের ছবি আছে?

হুঁ আছে। একটা ছবি। এনজিওতে চাকরির জন্য আমার ছবি দরকার আছিল। ঐ সময় আমার ছবির সাথে বকুলেরও ছবি তুলছিলাম। ঐ ছবিডাই আছে।

ছবিটা কোথায়? আমি কী দেখতে পারি?

হুঁ পারেন। ঐ যে পায়ের কাছে টিনের বাক্সডা দেখবার পাইতেছেন ঐডার মইধ্যে আছে। খুললেই পাবেন, একটা কাগজের ভাজের মইধ্যে আছে।

ডাক্তার তরফদার টিনের বাক্সটা খুললেন। ভিতরে যা কিছু আছে সবই বকুলের। একটা ইংলিশ হাফপ্যান্ট, একটা গেঞ্জি, ভাঙ্গা একটা গাড়ি, একটা আদর্শলিপি বই, অনেকগুলো মার্বেল, একটা কলম, একটা বাঁশি আর একপাশে ভাজ করা একটা কাগজ। কাগজটা হাতে তুলে ভাজটা খোলার সময় তার হাত দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল। তার বার বার মনে হতে লাগল তিনি বুঝি অনিকের ছবিটা দেখবেন।

ডাক্তার তরফদার বকুলের যে ছবি দেখলেন তার সাথে অনিকের চেহারার মিল নেই। অনেক আলাদা। তবে বকুলের চেহারাটা খুব মিষ্টি। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ছবিটি তুলেছে সে। ঠোটে বিস্তৃত হাসি। এরকম একটা ছবি যে কেউ দেখলে সে ছবিটার মায়ায় পড়ে যাবে। ডাক্তার তরফদারও সেরকম এক মায়ায় জড়িয়ে গেলেন। এই মায়ার কারণেই তিনি ঠিক করলেন কুলসুমের চিকিৎসা করিয়ে তিনি কুলসুমকে সুস্থ করে তুলবেন।

ডাক্তার তরফদারের এরকম ভাবনার মাঝে মোবাইল ফোনে রিং হতে লাগল। ডিসপ্লে মনিটরে দেখলেন নাজমুল হাসান ফোন করেছেন। ফোন রিসিভ করতে নাজমুল হাসান উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ডাক্তার সাহেব সর্বনাশ হয়েছে! অনিককে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ও স্কুলে নেই।

কী বলছেন আপনি!

হ্যাঁ। সকালে ওর আম্মু ওকে স্কুলে দিয়ে নিজেই স্কুলে বসেছিল। কিন্তু কোনো এক ফাঁকে অনিক স্কুল থেকে বের হয়ে গেছে। ওর আম্মু তো কেঁদে কেটে অস্থির। এখন আমি কী করব?

ডাক্তার তরফদার একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, অনিকের ঘরে একটা মাটির ব্যাংক ছিল, ওটার কী অবস্থা?

আমি তো জানি না।

আপনি কি বাসায়?

হ্যাঁ।

তাহলে একটু দেখুন না?

বিশ সেকেন্ডের মাথায় নাজমুল হাসান বললেন, ব্যাংকটা ভাঙ্গা, একটা পয়সাও নেই।

বুঝতে পেরেছি। আপনি অতটা চিন্তা করবেন না। সরাসরি গাবতলী বাসস্ট্যান্ড চলে যান। সেখান থেকে যে বাসগুলো ফরিদপুর আসবে সেগুলো পরীক্ষা করুন। আমার বিশ্বাস ও শিমুলতলীর ইদ্রা গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

কী বলছেন আপনি!

হ্যাঁ, আমরাই আসলে দেরি করে ফেলেছি। যা বললাম তাই করুন।

কি..কিন্তু...মানে ও যদি সত্যি শিমুলতলীর উদ্দেশে রওনা দিয়ে থাকে, তাহলে কী হবে? ও কী পৌঁছাতে পারবে? পথে হারিয়ে যাবে না তো? আর তাছাড়া ওখানে কেউ নেই..

ভয় পাবেন না। আমি ইদ্রা গ্রামে আছি। আমি এখন শিমুলতলী বাসস্ট্যান্ডে যাচ্ছি। অনিক এলে আমি ওর প্রতি লক্ষ রাখব।নাজমুল হাসান এবার কাঁপা কণ্ঠে বললেন, ই..ইদ্রা গ্রামে ইয়ে মানে কুসুম নামের কেউ আছে?

আমরা আগে অনিককে খুঁজে বের করি। তারপর না হয় অন্য বিষয়গুলো জানব। আপনি এখনই গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে যান। আর দেরি করবেন না।

ডাক্তার তরফদার কথা বলতে বলতে বাড়ির উঠোনে এসেছেন। তিনি বাড়িটার চারপাশে তাকিয়ে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। গন্তব্য শিমুলতলী বাসস্ট্যান্ড।

১৫

কবির মাতুব্বর ডাক্তার তরফদারের সাথে মাসুম শিকদারের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। কবির মাতুব্বর আর মাসুম শিকদার সমবয়সী। পরিচয়ের পর ডাক্তার তরফদারের সাথে সে শিমুলতলী বাস্ট্যান্ডে এসেছে। একটা চায়ের দোকানে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ডাক্তার তরফদার বললেন, আপনি হারুনুর রশিদের সাথে কতদিন ছিলেন?

হারুন ভাই তো আমাদের গ্রামেরই, হে যতদিন বাঁইচা আছিল ততদিন আছিলাম।

মানুষ হিসেবে হারুনুর রশিদ কেমন ছিল?

খুউব ভালো। আমি আপনেরে বুঝাবার পারব না। সবই করত, খালি সংসার ধর্ম ছাড়া। সংসারের প্রতি তার অতডা মনোযোগ আছিল না। খালি গান নিয়া থাকত। এইজন্য কুলসুম ভাবীজান মাঝে মইধ্যে তারে বকাঝকা করত। তয় হে কোনো সময় রাগত না। হাইসা হাইসা বলত, বৃষ্টি ভেজা জোছনা আইলে সব ঠিক হইয়া যাবে।

ডাক্তার তরফদার চোখ কুঁচকে বললেন, বৃষ্টি ভেজা জোছনা, সেটা বলতে আসলে সে কী বুঝাত?

আসলে বৃষ্টি ভেজা জোছনা একটা গানের অংশ। এই গানডা হারুন ভাইজানের খুব প্রিয় আছিল। আমরা আসরে বসলে গাইতাম। হারুন ভাই বিশ্বাস করত জোছনা রাইতে যদি বৃষ্টি হয় আর সেই বৃষ্টিতে জোছনা ভিজা যায় হেইডা হইল বৃষ্টি ভেজা জোছনা। ঐ জোছনা নাকি খুব সুন্দর, ঐ জোছনা নাকি শান্তি নিয়া আসে, সব দুঃখ কষ্ট দূর কইরা দেয়।

এটা তার মনের কল্পনা ছিল।

কল্পনা আছিল না, হে মনে হয় বিশ্বাসও করত। অনেকদিন দেখছি বকুলরে হে বলতেছে, বৃষ্টি ভেজা জোছনা আইলে দেখবি সব দুঃখ চইলা গেছে। তহন খালি আনন্দ আনন্দ। বকুল তা বিশ্বাস করত। আমাগো মইধ্যেও অনেকে বিশ্বাস করত। কুলসুম ভাবীজানও মনে হয় বিশ্বাস করত।

তাই নাকি!

হঁ। আসলে হারুন ভাইজানের অন্যরে ভুলাবারর দারুন একটা ক্ষমতা আছিল। যে কেউ তার সাথে কথা বললে অল্প সময়ে তার ভক্ত হইয়া যাইত। মানুষ হিসেবে হে আছিল অসাধারণ। কাউরে কোনো সময় কষ্ট দিত না। তয় অভাব তারে শ্যাষ কইরা দিছে। গান গাইয়া কী আর জীবন চলে?

ডাক্তার তরফদার একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, তার কী অন্য কোনো ক্ষমতা ছিল?

মাসুম শিকদার বুঝতে না পেরে বলল, অন্য কোনো ক্ষমতা মানে?

এমন কোনোকিছু যা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা স্বাভাবিক না, মনে হয়েছে অলৌকিক কিংবা ঐশ্বরিক।

মাসুম শিকদার খানিকক্ষণ মনে করার চেষ্টা করে বলল, ঐ রকম কিছু মনে পড়তেছে না। তয় তার অনেক মেধা আছিল। অল্পসময়ে নতুন গান বানবার পারত। তারপর হেই গান নিজেই গাইত।

হারুন বাউল আর তার সন্তান বকুলের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

খুউব ভালো। হারুন ভাই বকুলরে মেলা ভালবাসত। আমি কোনোদিন বকুলের উপর তারে রাগবার দেহি নাই, মাইর পিট বকাঝকা করা তো দূরের কথা।

পরিবার হিসেবে তারা কেমন ছিল?

সবাই মিলা সুখীই আছিল। অভাব আছিল ঠিকই, তয় সুখও আছিল। আপনে তো জানেন, মানুষ যত টাকার মালিকই হোউক না কেন, অভাব কোনো সময় শ্যাষ হয় না। মানুষ সবসময়ই অভাবী থাকে।

খুব সুন্দর কথা বলেছেন তো আপনি, 'মানুষ সবসময় অভাবী থাকে'।

এইডা আমার কথা না, হারুন ভাইয়ের কথা। হে বলত, মানুষের কোনো অভাব না থাকলেও মানুষ মনে মনে একটা অভাব সৃষ্টি কইরা নেয়। কারণ মানুষ অভাবে থাকবার ভালোবাসে। আসলে অভাবহীন কোনো মানুষ নাই। এইজন্য অভাবে কারো কষ্ট পাওয়া উচিত না। তয়..

তবে কী?

শুধু কিছু মানুষ আছে যাগো কোনো চাওয়া পাওয়া নাই। তারা কখনো অভাবী হয় না, তারা হয় সুখী। হারুন ভাই আছিল এমন একজন মানুষ। তার ভাতের অভাব থাকলেও সুখের অভাব আছিল না। কারণ তার কোনো চাওয়া পাওয়া আছিল না। তারে কহনও নিজের জন্য আক্ষেপ করবার দেহি নাই। যা দেখছি অন্যের জন্য। এইজন্য হে বৃষ্টি ভেজা জোছনার জন্য অপেক্ষা করত। কারণ বৃষ্টি ভেজা জোছনা আসলে অন্য কারো দুঃখ থাকবে না।

বৃষ্টি ভেজা জোছনা আপনি কখনও দেখেছেন?

জোছনার পরে বৃষ্টি হইছে দেখছি। বৃষ্টির পর জোছনা উঠছে এইরহমও দেখছি। কিন্তু বৃষ্টির মইধ্যে জোছনা আছে, কিংবা জোছনার মইধ্যে বৃষ্টি হইতেছে এমন দেহি নাই।

আসলেই কী বৃষ্টি ভেজা জোছনা বলে কিছু আছে?

জানি না। আমি অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখবার পারি নাই।

হারুনুর রশিদ কী দেখেতে পেরেছিল?

এই প্রশ্ন তারে আমি কোনো সময় জিজ্ঞেস করি নাই। তয় মনে হয় দ্যাখছে। না দ্যাখলে বলবে ক্যান?

ডাক্তার তরফদার কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করে বললেন, বকুল মারা গিয়েছিল কীভাবে?

জ্বরে মারা গেছিল।

জ্বরে?

এর মধ্যে আপনে নিশ্চয় বুঝবার পারছেন বকুলরা খুব অভাবে আছিল। খেজুরের পাতার মাদুর বানাইয়া, কাথা সেলাই কইরা, টুকটাক কাম-কাইজ কইরা ওর মা সংসার চালাইত। প্রত্যেক ঝড় বৃষ্টি শ্যাষে আশেপাশের বাগানে গাছের ডাল আর ঝড়ে পড়া আম কিংবা অন্য ফলমূল কুড়াইতে যাইত। এইরকম এক ঝড়ের সময় মা ছেলে দুইজনে চৌধুরী বাড়ির বাগানে গেছিল আম কুড়াবার। ঐ সময় একটা ডাল আইসা পরে বকুলের উপর। বকুলের শরীরে তেমন কোনো ক্ষত হয় নাই, কিন্তু ওর জ্বর হইছিল। সাতদিন ছিল ঐ জ্বর, তারপর বকুল মারা যায়।

বকুলের কবরটা কোথায়?

ওগো বাড়িতেই। আপনে চাইলে আমি আপনেরে দেহায় দিব।

বাড়িতে গিয়ে কবরটা আমি দেখব। আর বকুলের বাবা হারুনুর রশীদের কবর?

বকুলের পাশেই। হারুন ভাই মারা যাবার আগে বইলা গেছিল তারে যেন তার বাড়িতেই মাটি দেয়া হয়। তার কথা রাখা হইছে। বাপ-ছেলের কবর একই জায়গায়।

ডাক্তার তরফদার আর কিছু বললেন না। চা শেষ করে রাস্তায় এসে থামা বাসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। একটা একটা করে বাস আসছে আর যাচ্ছে। শেষ এক ঘণ্টায় তিনি প্রায় বিশটি বাসকে এসে থামতে দেখেছেন। কিন্তু কোনোটিতে তিনি অনিককে দেখতে পাননি। তবে তিনি নিশ্চিত যে কোনো একটা বাসে অনিক ঠিকই আসবে।

ডাক্তার তরফদারের অনুমানই ঠিক হলো। দশ মিনিট পর ঢাকা থেকে আসা একটা বাস থেকে অনিক নামল। অনিকের পরনে স্কুলের প্যান্ট শার্ট। কাঁধে ব্যাগ। ডাক্তার তরফদার ফিস ফিস করে মাসুম শিকদারকে বললেন, আমরা ঐ ছেলেটিকে অনুসরণ করব। তবে ছেলেটি যেন কিছু বুঝতে না পারে।

মাসুম শিকদার অবাক হয়ে বলল, আমরা ওরে অনুসরণ করব ক্যান?

সেটা আমি আপনাকে পরে বলব। আপাতত শুধু এটুকু জেনে রাখুন, ঐ ছেলেটিকে আমি চিনি। নাম অনিক, ঢাকা থেকে এসেছে।

ঠিক আছে।

ডাক্তার তরফদার লক্ষ করলেন অনিক একটা ভ্যান ঠিক করল। তারপর সেই ভ্যানটিতে উঠে বসতে সেটা পাকা রাস্তা দিয়ে কাচা রাস্তায় গিয়ে নামল। এই রাস্তা দিয়েই ইদ্রা গ্রামে যেতে হয়। যেখানে রাস্তা শেষ সেখানে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অনিক সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। পথে দুজনকে জিজ্ঞেস করে সঠিক পথ চিনে নিল। একসময় অনিক নিজে নিজেই বেশ দ্রুত গতিতে হাঁটতে শুরু করল। অনিকের হাঁটা দেখে বোঝা যাচ্ছে অনিক পথটা চেনে। তা না হলে সে এত দ্রুত হাঁটত না। হাঁটার সময় সে এখন একবারও পিছনে তাকাচ্ছে না। এজন্য পিছনে যে তারা দুজন আছে সেটা জানতেও পারছে না।

অনিক স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে না। কারণ আশেপাশের কোনোকিছুর দিকে সে তাকাচ্ছে না, খানিকটা নিচের দিকে তাকিয়ে একমনে হাঁটছে। স্বাভাবিক মানুষ এভাবে হাঁটে না। মানুষ যখন খুব চিন্তিত থাকে তখন সে এভাবে হাঁটে। তারমানে অনিক কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করছে। কিন্তু কী চিন্তা করছে সে? ডাক্তার তরফদার অনুমান করতে চেষ্টা করেও ঠিক পারলেন না। তবে তিনি নিশ্চিত, তিনি খুব তাড়াতাড়ি অনিকের অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ বের করতে পারবেন।

১৬

ইদ্রা গ্রামের মাঠে পৌঁছে অনিক হঠাৎই ছুটতে শুরু করল। গ্রামের মেঠো পথের মধ্যে দিয়ে এমনভাবে সে ছুটতে লাগল যেন পথটা তার বহুদিনের পরিচিত। তারপর একেবারে গিয়ে উঠল কুলসুমের বাড়িতে। বাড়ির উঠোন পার হওয়ার সময় সে জোরে জোরে ডেকে উঠল মা, মা, মা আমি চলে এসেছি।

উত্তরের অপেক্ষা না করে অনিক ঢুকে গেল কুলসুমের ঘরের মধ্যে। ডাক্তার তরফদারও পিছন পিছন এসেছেন। তিনি এখন দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন। তিনি দেখতে চান অনিক কী করে।

কুলসুম চোখ বুঝে ছিল। অনিকের 'মা মা' ডাক শুনে সে চোখ মেলে তাকাল। তারপর অবাক চোখে তাকিয়েই থাকল।

অনিক বলল, মা, কেমন আছ?

কুলসুম কোনো উত্তর দিল না। সে আগের মতোই তাকিয়ে থাকল।

অনিক এবার কুলসুমের একেবারে কাছে গিয়ে বলল, মা, তুমি কেমন আছ? কথা বলছ না কেন?

কুলসুম এবার বিড় বিড় করে বলল, তু..তুমি কিডা বাবা?

আ...আমি ব..কু..ল মা, আ..আমি বকুল।

তু..তু...মি বকুল।

হ্যাঁ মা, তোমার ছেলে বকুল। তোমাকে না আ..আমি বলেছিলাম আ..আমি আসব, চলে এসেছি।

না...না... তু...তুমি বকুল না, অন্য কেউ। তোমার চেহারা বকুলের মতো না।

আমি বকুল মা, এই যে আ..আ..আমি। তোমার মনে নেই তুমি আমি একসাথে এই বাড়িতে কত দিন থেকেছে, কত জায়গায় ঘুরতে গিয়েছি, বিলের ক্ষেতে ছুটে বেড়িয়েছি, খালে মাছ ধরেছি, খোলা মাঠে ঘুড়ি উড়িয়েছি, ঝড়ের মধ্যে আম কুঁড়াতে গিয়েছি।

কুলসুমের চোখ দুটো অনেকটাই সংকুচিত হল। সে বিড় বিড় করে বলল, কি..কিন্তু আ..আমার বকুল তো তোমার মতো এত সুন্দর আছিল না, তোমার মতো সুন্দরভাবে কথা বলবার পারত না, তোমার...

কথা শেষ করতে পারল না কুলসুম। তার আগেই তার কাশি শুরু হল। কাশির সাথে মুখ দিয়ে খানিকটা জমাট বাঁধা রক্তও বের হয়ে এলো। কুলসুম যে খুব অসুস্থ অনিকও বুঝতে পারল। তাই সে তাড়াতাড়ি বলল, মা চিন্তা করো না, আমি চলে এসেছি। আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

আমার সময় হয়ে এসেছে রে বাবা, ডাক্তারের কাছে গিয়া লাভ হবে না। আ..আর ডাক্তার মেলা টাকা চায়।

তাতে কী মা? আমি আমার ব্যাংক ভেঙ্গে তোমার জন্য টাকা নিয়ে এসেছি। আ..আর তোমার ঐ রূপার চুড়ি দুটো আছে না, দরকার হইলে ঐ চুড়ি দুটো এবার বিক্রি করে দেব।

রূপার চুড়ির কথা শুনে কুলসুম স্থির দৃষ্টিতে অনিকের দিকে তাকাল। তারপর বলল, রূপার চুড়ি, কোথায় ঐ দুইডা?

আমিই তো ঐদুটো চুড়িকে মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি নিয়ে আসছি, তুমি চিন্তা করবে না।

কথাগুলো বলে অনিক ছুটে বাইরে বের হয়ে এলো। দরজায় যে ডাক্তার তরফদার আর মাসুম শিকদার দাঁড়িয়ে আছে লক্ষই করল না সে। বাড়ির বেড়ার সাথে গুজে রাখা পুরোন একটা দা নিয়ে ছুটে গেল বাড়ির পিছনে কদবেল গাছের নিচে। তারপর মাটি খুঁড়তে শুরু করেল। বেশ অনেকখানি মাটি খুঁড়ল সে। সেখান থেকে একটা পলিথিনের ব্যাগ বের করে ছুটে এল কুলসুমের কাছে। পলিথিনটা এগিয়ে দিতে কুলসুম কাঁপা হাতে পলিথিনটা নিল। যখন দেখল পলিথিনের মধ্যে তার সেই রূপার চুড়ি দুটো, যে দুটো কিনা এখন থেক আট বছর আগে তার সন্তান বকুল মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিল তখন আর সে নিজের আবেগকে ধরে রাখতে পারল না। তার চোখ দিয়ে গল গল করে পানি বেরিয়ে এল।

অনিক ছলছল দৃষ্টিতে বলল, মা, তুমি এবার বিশ্বাস করছ আমি তোমার বকুল।

কুলসুম তখনও দ্বিধাগ্রস্ত দেখে অনিক এবার ছুটে পাশের টিনের বাক্সটির কাছে গেল। ভিতর থেকে কুলসুম আর বকুলের ছবিটা বের করে বলল, মা, এই যে তুমি আমি ছবি তুলেছিলাম। তোমার মনে আছে?

কুলসুম অনিকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ডুকরে উঠে বলল, আ..আমি তোরে চিনবার পারছি বাবা।

কুলসুমকে 'তুই' বলতে শুনে চোখে পানি চলে এলো অনিকের। সে কুলসুমকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা, আমি বলেছিলাম না আমি আসব, ঠিকই তোমার কাছে চলে এসেছি। মা. ও মা...

এবার 'মা ও মা' ডাক শুনে তীব্র এক আবেগে কুলসুমের সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে শুরু করল। কথা বলার চেষ্টা করেও সে এখন ঠিকমতো পারছে না, জড়িয়ে যাচ্ছে। জড়ান কণ্ঠেই বলল, ব..বকুল, বকুলরে...

বলো মা।

তুই মেলা কষ্ট কইরা আইছস, নারে বাপ?

না মা কষ্ট হয় নাই।

আ..আমি জানি তুই মেলা কষ্ট কইরা আইছস। কি..কি..ন্তু আ..আমি যে শ্যাষ হইয়া গেছি, শরীরে কোনো শক্তি নাই, তোরে ভালোমন্দ কিছু খাওয়াবার পারব না, তোরে নিয়া আর খাল পাড়ে যাবার পারব না, ধা..ধান ক্ষ্যাতে যাবার পারব না, কলমী ফুল ছিড়া দিবার পারব না, আকাশে ঘুড্ডি উড়াবার পারব না, ঝড়ের মইধ্যে আম কুড়াবার যাবার পারব না..আর.. আর..

কথা শেষ না হতে আবার কাশি শুরু হল কুলসুমের। কাশতে কাশতে কুলসুমের শরীরটা একেবারে বেঁকে গেল। কাশি থামতে বেশ সময় লাগল এবার।

অনিক বলল, মা তুমি চিন্তা করো না, আমি তোমারে হাসপাতালে নিয়া যাব, হাসপাতালে..

না রে বকুল না, এই বাড়ি ছাইড়া আ..আমি আর কোথাও যাব না। তুই আইছস এইডাই আমার বড় শান্তি। আ..আমি তোরে দেইখা মরবার পারতেছি, এর থেকে বড় পাওয়া আর কিছু নাই। আইজ আমার কী মনে হইতেছে জানস?

কী মনে হচ্ছে?

আ..আমি বৃষ্টি ভেজা জোছনা দেখবার পারব। তু..তুই ঘরের ঐ কোনার জানালাটা খুইলা দিবি?

দিব মা, দিব।

অনিক ছুটে গিয়ে জানালায় পাটখড়ির পাল্লা সরিয়ে দিল।

সেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কুলসুম বলল, বকুল, আইজ রাইতে বৃষ্টি ভিজা জোছনা দেহা যাবে। আইজ তুই বৃষ্টি ভিজা জোছনা দেখবার পারবি, বৃষ্টি ভিজা জোছনা। দেখবি তো?

হ্যাঁ মা, তোমাকে নিয়ে দেখব।

আমি যদি নাও থাকি, তুই দেহিস। দেখবি কত সুন্দর!

তুমি থাকবা না ক্যান মা?

আমার যাবার সময় হইয়া গেছে। আমার হাতে আর সময় নাইরে, আর সময় নাই।

না মা আছে, মেলা সময় আছে।

কুলসুম মৃদু হাসার চেষ্টার করল। কিন্তু পারল না। তীব্র ব্যথায় তার মুখটা বেঁকে গেল। তারপরও টেনে টেনে বলল, তু..তুই আগের চাইতে মেলা সুন্দর হইছস রে বকুল, মেলা সুন্দর হইছিস!

মা!

আ..আ...মি...

কথা শেষ করতে পারল না কুলসুম। হঠাৎই তীব্র ব্যথায় তার সমস্ত শরীরটা ঝাকি দিয়ে উঠল। একইসাথে চোখ দিয়ে গল গল করে পানি বেরিয়ে এলো। সে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমার হাতটা ধরবি বকুল।

অনিক কুলসুমের হাত ধরলে কুলসুম আবার হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শুধু বিড় বিড় করে বলল, বড় শান্তিরে, বড় শান্তি...

মা!

ভালো থাহিস রে বাবা, ভালো থা..হি..স।

মা!

আমি থাকব, তোর মাঝেই থাকব, থাকব তোর 'মা' ডাকে। আয় বাবা, আমার বুকে আয়।

অনিক কুলসুমের বুকের উপর মাথা রাখলে কুলসুম অনিকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ঐ গানটা শুনবি বাবা? ঐ যে বৃষ্টি ভিজা জোছনার গান।

শুনব মা, শুনব।

কুলসুম বিড় বড়ি করে গানটা গাইতে শুরু করল,

আয় শান্তি আয়, আয় শান্তি আয়
দুঃখ কষ্ট আর অশান্তির এই দুনিয়ায়
আয় শান্তি আয়, সবার জন্য আয়
দূর আকাশের ঐ বৃষ্টি ভেজা জোছনায়।

১৭

কুলসুম মারা গেল পড়ন্ত বিকেলে। তার স্বামী হারুনুর রশিদ আর ছেলে বকুলের পাশেই তাকে মাটি দেয়া হলো। মাটি দেয়ার সময় নাজমুল হাসানও ছিলেন। শিখা রহমান তখন ছিলেন অনিকের পাশে। কুলসুমের মৃত্যুর সাথে সাথে অনিক জ্ঞান হরায়। সেই জ্ঞান এখনও ফিরেনি।

গ্রামের সবার সাথে কথা বলে নাজমুল হাসানের বিদেয় নিতে রাত দশটা বেজে গেল। অপিরিচিত নাজমুল হাসান, শিখা রহমান, অনিক আর ডাক্তার তরফদারের ইদ্রা গ্রামে আকস্মিক আগমনে গ্রামের সবাই বিস্মিত হলেও তারা ঠিকভাবে জানতে পারল না কুলসুমের সাথে তাদের সম্পর্ক কী ছিল এবং তারা কেনই বা এসেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে সম্পূর্ণ বিষয়টা রহস্যময়ই থেকে গেল।

ফরিদপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে গাড়ি ছুটে চলছে। গড়ির মধ্যে জ্ঞান ফিরে এলো অনিকের। সে পিট পিট করে শিখা রহমানের দিকে তাকাল। তারপর বলল, মা পানি খাব।

হতবিহ্বল শিখা রহমান অনিককে পানি দিলে অনিক অনেকটুকু পানি খেল। তারপর গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নাজমুল হাসানকে বলল, বাবা বাবা, দ্যাখো, কী সুন্দর বৃষ্টি, আর বৃষ্টিতে জোছনাগুলো কত সুন্দর! ওগুলো বৃষ্টি ভেজা জোছনা, তাই না বাবা?

নাজমুল হাসান মাথা দুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা, ওগুলো বৃষ্টি ভেজা জোছনা।

এরপর আর কেউ কথা বলল না। সবাই জোছনার দিকে তাকিয়ে থাকল। সত্যি জোছনাটা খুব সুন্দর। কারণ আজকের জোছনা বৃষ্টি ভেজা জোছনা। এই জোছনা শান্তির জোছনা, ভালোবাসার জোছনা, সবার দুঃখ কষ্ট আর যন্ত্রণা লাঘবের জোছনা। এজন্যই হয়তো নাজমুল হাসান আর শিখা রহমানের মনে আজ আর কোনো দুঃখ, কষ্ট নেই, নেই কোনো যন্ত্রণা। তাদের মনে আজ শুধু শান্তি, শুধুই শান্তি। কারণ আজ অনিক তাদের 'বাবা মা' বলে ডেকেছে। এই ডাকটার জন্যই তারা অনেকদিন অপেক্ষা করেছিল।

এক সপ্তাহ পর।

ডাক্তার তরফদারের সামনে নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান বসে আছেন। অনিক আগের মতো করিম চাচার সাথে খেলছে। ডাক্তার তরফদার ফাইলে কিছু একটা লিখছিলেন। লেখা শেষ করে বললেন, তো আপনাদের কী খবর? অনিকের মধ্যে অন্য কোনো পরিবর্তন?

শিখা রহমান বললেন, না, অনিক এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

আগের মতো কোনো সমস্যা হচ্ছে না?

জি না।

তাহলে শুধু শুধু এসেছেন কেন?

আপনাকে ধন্যবাদ দিতে।

এটা অবশ্য ভালো কাজ করেছেন। ডাক্তারকে কেউ কখনও ধন্যবাদ দেয় না। অসুখ সেরে গেলে সবাই ভুলে যায়। আপনারা ভুলে যান নি, বিষয়টা আমাকে বেশ আনন্দিত করেছে। বসুন পায়েস খান।

শিখা রহমান খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, পায়েস!

হ্যাঁ পায়েস। আমি না বলেছিলাম আমার বাড়ির দোতলায় পরী নামের একটি মেয়ে আছে। তার হাতের পায়েস পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পায়েস। সেটাই পরখ করে দেখুন। ভালো লাগবে।

কথা বলতে বলতে ডাক্তার তরফদার চেয়ার থেকে উঠে গেলেন। তারপর দুজনের জন্য দু'বাটি পায়েস নিয়ে এলেন। নিজেও এক বাটি নিলেন।

পায়েস মুখে দিয়ে নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান প্রায় একই সাথে বললেন, অসাধারণ!

ধন্যবাদ।

এরপর কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাই চুপ হয়ে গেল। নাজমুল হাসান এখন পর্যন্ত তেমন কোনো কথা বলেননি। ডাক্তার তরফদার তাই বললেন, মনে হচ্ছে আপনি কিছু নিয়ে বেশ চিন্তায় আছেন? একেবারে কথা বলছেন না।

নাজমুল হাসান অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বললেন, না অতটা চিন্তায় নেই, আসলে এখানে আসার আগে মোবাইল ফোনটা খুঁজে পাই নি। এখন মোবাইল ফোন ছাড়া চলছি। মোবাইল ফোন না থাকলে কেমন যেন একরকম শূন্যতা কাজ করে।

কল করলেই হতো, রিং বেজে উঠত।

ফোনটা সাইলেন্ট মুডে ছিল।

সমস্যা নেই, পেয়ে যাবেন। এটা নিয়ে অত চিন্তা করবেন না।

আবার সবাই চুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পার হতে এবার শিখা রহমান নিজে থেকে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, আসলে একটা বিষয় খুব জানতে ইচ্ছে করছে। সেটা হল, অনিক কেন ঐরকম ব্যবহার করেছিল?

ডাক্তার তরফদার একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, দেখুন প্রকৃতি খুব রহস্যময়। রহস্যময় এই প্রকৃতি মাঝে মাঝে এমন রহস্যের জন্ম দেয় যেগুলোর ব্যাখ্যা মানুষের পক্ষে দাঁড় করান সম্ভব হয় না। অনিকের অস্বাভাবিক আচরণের বিষয়টি সেরকমই এক রহস্য। আপনাদের কাছ থেকে সবকিছু শোনার পর আমি নানাভাবে অনিকের আচরণগত সমস্যার ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছি। একসময় মনে হচ্ছিল অনিক আপনাদের পালক সন্তান কিন্তু বিষয়টা কেউ জানে না। ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে যখন নিশ্চিত হলাম অনিক পালক সন্তান না তখন মনে হচ্ছিল বুঝি সিটি

ক্লিনিকে আপনাদের সন্তান অন্য কারো সন্তানের সাথে বদলে গেছে। যখন নিশ্চিত হলাম সেরকমও না, তখন ভাবলাম বুঝি আপনাদের অবহেলার কারণে সে অবচেতন মনে নিজেই একটা কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করে নিয়েছে। এই ধারণাটা অবশ্য আমার প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু দেখা গেল সেটাও না। শেষে ঠিক করলাম যাকে নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি অর্থাৎ 'কুসুম' তাকে খুঁজে বের করি। এ কুসুমকে খুঁজতে গিয়েই মূল রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেল। পেয়ে গেলাম কুলসুম নামের অপরিচিত এক নারীকে।

একটু থেমে ডাক্তার তরফদার আবার বলতে শুরু করলেন, মূলত কুলসুমের সন্তান অর্থাৎ বকুলের স্মৃতিটাই পেয়েছে অনিক। এজন্য কুলসুমের বাড়ি থেকে শুরু করে সবকিছুর বর্ণনা অনেকটা নির্ভুলভাবে দিতে পেরেছে সে। শেষ পর্যায়ে নিজের নামটাও যে বকুল ছিল সেটাও মনে করতে পেরেছে। অবশ্য বড় একটা ভুল সে প্রথম থেকেই করছিল। কুলসুমকে কুসুম বলেছিল। এটা হতেই পারে। অনেক পুরাতন স্মৃতি থেকে নামটা সে সঠিকভাবে মনে করতে পারছিল না বলে কুলসুমের 'ল' বাদ গিয়ে কুসুম বলেছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু না। অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য বিষয়টা হল 'বকুলের স্মৃতি কীভাবে অনিকের মস্তিষ্কে এলো'। আসলে এর কোনো সুনির্দিষ্ট এবং সর্বগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই। তবে প্রচলিত থিওরির ভিত্তিতে কিছু ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। কোনো কোনো ধর্মের মানুষ বিশ্বাস করে মানুষের পূনর্জন্ম হয়। এক্ষেত্রে হতে পারে বকুলের পূণর্জন্ম হয়েছে। এই তত্ত্ব বিশ্বাস করা বা না করা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে এরকম ঘটনা কিন্তু আগেও ঘটেছে। সত্য একটা ঘটনার কথা আমি আপনাদের বলছি,

> ১৯৫৫ সালে ভারতে প্রকাশ নামের চার বছর বয়সী একটি ছেলে দাবী করতে থাকে, যে পরিবারে সে বড় হচ্ছে সেই পরিবার তার নিজের পরিবার নয় এবং তার বাবা মা আসল বাবা মা নয়। আসল বাবা মা পরিবারসহ মাথুরায় বসবাস করে। সে সুন্দরভাবে মাথুরায় তার পূর্ব পরিবারের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারছিল। পাশাপাশি তাদের বাড়ির বিবরণ এবং বাড়ির ভিতরে কী কী আছে সেগুলোর বিবরণও সে দিতে পারছিল। সে আরও জানায় পূর্বে তার নাম ছিল নির্মল এবং সবাইকে অনুরোধ করতে থাকে তাকে তার পূর্বের বাড়িতে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। তখন তাকে মাথুরার ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং দেখা যায় যে সে সেখানে তার পূর্বের বাবা মা, আত্মীয়-স্বজনসহ সকলকে যথাযথভাবে চিনতে পারছে। পরবর্তীতে স্টিভেনসন নামক একজন গবেষক বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণাও করেন এবং নিশ্চিত করেন নির্মল আগে কখনও মাথুরায় আসেনি এবং পরিবার দুটোর মধ্যে আগে কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না। তাহলে কীভাবে প্রকাশ তার পূর্বের জীবন সম্পর্কে জানতে পেরেছিল? ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।[১]

উপরের ঘটনা যে একমাত্র তা নয়। এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে এবং সবগুলোই রহস্যময়। রহস্যময় এই ঘটনাগুলোর বৈজ্ঞানীক ব্যাখ্যা এখনও বের করা সম্ভব হয়নি। তবে আমাকে যদি বলেন হয়তো শক্তির সূত্রে কিছু ব্যাখ্যা আমি দেয়ার চেষ্টা করতে পারি। এই ব্যাখ্যা একান্তই নিজস্ব। ব্যাপারটা এরকম যে 'মানুষের চিন্তা একরকম শক্তি'। আমরা জানি শক্তির কোনো বিনাশ বা ধ্বংস নেই। মৃত্যুর সাথে সাথে চিন্তা বা স্মৃতি নামের যে বিষয়টা মানুষের মস্তিষ্কে থাকে

[1] http:/claimsofincarnation.blogspot.com
search conducted on 31 December 2013.

সেটা এক ধরণের গতিশীল স্মৃতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। গতিশীল এই স্মৃতিশক্তি পৃথিবী কিংবা মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই স্মৃতিশক্তির একটা আকার আছে। যদি কারো মস্তিষ্কের গঠন, ঘুরে বেড়ানো স্মৃতিশক্তির আকারটাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে তাহলে স্মৃতিটাকে গ্রহণ করে তার অর্থ উদ্ধার করতে পারে। প্রক্রিয়াটা খুব জটিল মনে হতে পারে আপনাদের কাছে। যদি আমরা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে সহজ হয়ে যাবে। প্রকৃতিতে অনেক শক্তি আছে যেগুলোকে আমরা দেখতে পাই না, যাদের অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি না, এমন কি বুঝতেও পারি না। যেমন ধরুন কিছু শব্দ আছে যেগুলো শুধু কুকুর শুনতে পায়, আরও কয়েক ধরনের প্রাণী শুনতে পায়। কিন্তু মানুষ শুনতে পায় না। এজন্য একটা মানুষ এবং কুকুর পাশাপাশি থাকলে কুকুর কিছু শব্দের উপস্থিতি উপলব্দি করে কিন্তু মানুষ তা করে না। এগুলোকে বলে শ্রবনোত্তর শব্দ। ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর হলেও সত্য। অর্থাৎ একটা শক্তি শব্দের আকারে আছে অথচ আমরা তা শুনতে পাচ্ছি না। ঠিক একইভাবে একটা মৃত মানুষের স্মৃতিশক্তি প্রকৃতিতে ঠিকই ঘুরছে কিন্তু আমরা তা উপলব্দি করতে পারছি না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, ঘুরে বেড়ানো স্মৃতি শক্তিটা সবার মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে না কেন। ঐ যে বললাম, শক্তিটার একটা আকার আছে কিংবা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেটা সকল মস্তিষ্ক গ্রহণ করতে পারে না। এই বিষয়টা ওষুধের কার্যকারিতার রিসেপটর মেকানিজম দিয়ে ব্যাখা করা যেতে পারে।

আমরা সবাই জানি, শরীরে ক্যান্সার হওয়া মানে অতিরিক্ত কিছু কোষের সৃষ্টি হওয়া যেগুলো খুব দ্রুত বৃদ্ধি হতে থাকে। যখন আমরা ক্যান্সারের ওষুধ খাই তখন দেখা যায় ক্যান্সার সেল বা কোষগুলো মারা যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের শরীরের সাধারণ কোষগুলো ভালো থাকছে। এটা সম্ভব হয় রিসিপটর মেকানিজমের মাধ্যমে, ব্যাপারটা অনেকটা তালা চাবির মতো। এখানে ক্যান্সার সেলগুলো তালা আর ওষুধ গুলো চাবি। সাধারণ কোষের থেকে ক্যান্সার কোষের আকার আকৃতি ভিন্ন হয়। ওষুধরূপী চাবিগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন এগুলো শুধু ক্যানসার কোষ নামক তালায় প্রবেশ করে সেখানে ক্ষতি করতে পারি। স্বাভাবিক কোষগুলোর গঠন ভিন্ন হওয়ায় সেখানে প্রবেশ করতে পারে না বা পারলেও খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না। বিষয়টা স্বাভাবিক চোখে আমরা দেখতে পারি না বলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ফার্মাসিউকিট্যাল সায়েন্সে এখন এভাবে অনেক ওষুধ তৈরি করা হয়, পদ্ধতিটিকে মলিউকিলার ড্রাগ ডিজাইন (Molecular Drug Design) বলে। আমার বিশ্বাস চলমান গতিশীল স্মৃতিটাও এরকম একটা চাবি যেটা কিনা অন্য একটা মস্তিষ্করূপী তালার মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে। যখনই মস্তিষ্কের গঠন এবং স্মৃতির গঠন চাবির গঠনের সাথে মিলে যায় তখন মস্তিষ্ক স্মৃতিটাকে পড়তে পারে। বিষয়টা খুব বিরল এবং কদাচিৎ ঘটে থাকে। বকুল এবং অনিকের ক্ষেত্রে এরকম ঘটেছে। বকুলের মৃত্যুর সাথে সাথে তার স্মৃতিটা, স্মৃতিশক্তি বা অন্য কোনো অজানা শক্তির রূপে প্রকৃতিতে বিচরণ করতে থাকে এবং একসময় অনিকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সম্ভবত দীর্ঘদিন ধরে স্মৃতিটা অনিকের কিংবা অন্য কোনো মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি। যখন অনিকের আট বছর হয়েছে তখন প্রবেশ করেছে। অথবা এমনও হতে পারে দীর্ঘ আট বছর স্মৃতিটা শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে তারপর অনিকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে। আর এরকম হওয়ার পর থেকেই বকুলের স্মৃতিশক্তিটা ধীরে ধীরে অনিকের মস্তিষ্ক দখল করে নিয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। তখন অনিক বকুলের স্মৃতিকেই তার নিজের স্মৃতি বলে মনে করতে থাকে। নিজের মধ্যে গ্রামের বাড়ির জন্য, তার মায়ের জন্য, সুন্দর সুন্দর স্মৃতির জন্য ভয়ানক এক টানের সৃষ্টি হয়। তারপর একসময় নিজেই গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। কুলসুমের মৃত্যুর সাথে সাথে অনিক মানসিকভাবে যে তীব্র আঘাত পায় সেই আঘাতের কারণে সম্ভবত তার মস্তিষ্কে বকুলের স্মৃতিটা আবার বের হয়ে যায়। এজন্য সে বকুলের স্মৃতির সবকিছু আবার ভুলে গেছে। সাধারণভাবে এই স্মৃতি আর ফিরে আসার কথা নয়, তবে আসতেও

পারে। এজন্য আপনাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। আপনাদের ভালোবাসা দিয়ে ওকে এমনভাবে আপন করে নিতে হবে যেন অন্য কোনো স্মৃতি এসে তার মস্তিষ্কে স্থান করে নিতে না পারে। অবশ্য একটা বিষয়ের ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না, কীভাবে অনিক বুঝেছিল কুলসুম অসুস্থ। বিষয়টা আর একটা রহস্য। হতে পারে টেলিপ্যাথি। টেলিপ্যাথির ব্যাখ্যা ভিন্ন। অন্য একদিন দেব।

এতখানি কথা বলে ডাক্তার তরফদার লম্বা একটা দম নিলেন। তারপর আবার বলতে থাকলেন, আমি জানি আমার এই ব্যাখ্যাগুলো আপনারা হয়তো ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। না পারারই কথা। কারণ আমি এক অদৃশ্য অজানা জগতের কথা বলছি যার অস্তিত্ব সাধারণ কেউ উপলব্দি করতে পারে না। খুব স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে দেখুন তো, আপনারা যে জগতটা দেখতে পাচ্ছেন তার আশেপাশে আপনার অদেখা কোনো দ্বিতীয় জগত আছে কিনা?

নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান দুজনেই মাথা নেড়ে বললেন, না নেই।

ডাক্তার তরফদার হেসে দিয়ে বললেন, আপনাদের ধারণা ঠিক নয়, আছে। অদেখা দ্বিতীয় জগত আছে। আমি কিছুক্ষন আগে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছি। যেমন বলেছি শব্দের জগতের কথা। যে শব্দ আমরা শুনতে পাই না, সেই শব্দ প্রকৃতিতে আছে। একটা দুটো নয়, দশ বিশটা নয়, হাজার হজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। এই শব্দগুলো কী একেবারেই অপ্রয়োজনীয়? না অপ্রয়োজনীয় নয়। প্রকৃতি কোনো না কোনো কারণে এই শব্দ বা শক্তিগুলো সৃষ্টি করেছে এবং অদেখা জগতে রেখে দিয়েছে। এই শক্তিগুলোর অনেক গুরুত্ব। আমার ধারণা, আমাদের দেখা জগতের থেকে না দেখা জগতে শক্তি অনেক অনেক বেশি। সেখানে যে শুধু শব্দ শক্তি আছে তা নয়, আলোক শক্তিও রয়েছে।

নাজমুল হাসান চোখ কুচকে বললেন, আলোক শক্তিও আছে?

অবশ্যই। এক্সরে, কসমিক রে, গামা রে এগুলো কথা আপনারা জানেন। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না, অথচ এক একটার কী অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। মোটা মোটা লোহার পাতকে মুহূর্তেই এগুলো দিয়ে কেটে ফেলা সম্ভব। তার মানে আমরা চোখে যে সাদা আলো দেখি তার থেকে না দেখা আলোগুলো অনেক শক্তিশালী! ঠিক একইভাবে আমাদের না দেখা জগতটাও অনেক অনেক শক্তিশালী, ক্ষমতাধর। না দেখা জগতের শব্দ আর আলো এই দুটো শক্তির কথা শুধু আমরা জানি। আমার বিশ্বাস এখানে আরও অনেক শক্তি আছে যেগুলোর কথা আমরা জানি না। হয়তো সেই শক্তিগুলো যে কোনো মুহূর্তে একজনের স্মৃতিকে অন্যজনের মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দিতে পারে যার কারণে মানুষের মধ্যে অনিকের মতো মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তবে শক্তিটা কী রূপে আছে আমি জানি না, আপনি কিংবা আপনারাও জানেন না, আসলে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ জানে না। তবে আমরা উপলব্দি করতে পারি। উপলব্দি করার জন্য কোনো একটা অন্ধকার ঘরে চোখ বন্ধ করে একা বসে শুধু চিন্তা করবেন দ্বিতীয় জগতের কথা। ভাববেন আমার পাশে এমন কোনো শব্দ, আলো কিংবা শক্তি আছে যেগুলোকে আমি দেখতে পাই না, কিন্তু ওগুলো আছে এবং অনেক অনেক শক্তিশালী। এভাবে ভাবতে ভাবতে কিছুটা সময় কাটাবেন, দেখবেন কী হয়। হয়তো আপনি ঐ জগতে চলে গেলেও যেতে পারেন। অবশ্য ঐ দ্বিতীয় জগতে বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করবে না। এই জগতটা থেকে চলে আসতে ইচ্ছে হবে এবং আসবেন। কারণ একটাই, আমাদের শরীর মন দ্বিতীয় জগতের গতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না, এজন্য তাড়াতাড়ি পরিচিত এই জগতে ফিরে আসতে চায়। তবে, তবে কিছু কিছু মানুষ আছে তারা দ্বিতীয় জগতটাতে লম্বা সময় থাকতে পারে এবং তারা সেখানকার শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে। এই ক্ষমতা প্রকৃতি তাদের দিয়েছে। প্রকৃতি হয়তো নিজের প্রয়োজনে কখনো কখনো শক্তিগুলোকে ব্যবহারও করে। এর অন্যতম উদাহরণ অনিকের চিঠি। অনিকের চিঠিটা কীভাবে কুলসুমের কাছে পৌঁছেছিল তা বিরাট এক রহস্য। কারণ চিঠির

উপর নাম লেখা ছিল কুসুম, কিন্তু পৌঁছেছে ঠিকই কুলসুমের কাছে। এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল এর জবার হয়তো প্রকৃতিই দিতে পারবে, আমরা মানুষেরা নয়।

শেষের কথাগুলো ডাক্তার তরফদার এমনভাবে টেনে টেনে বললেন যে নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান বিস্মিত হয়ে শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন।

ডাক্তার তরফদার বলেই চললেন, একদিন হয়তো আমরা অদেখা বা না দেখা দ্বিতীয় জগত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব। তবে আমার বিশ্বাস, তখন অদেখা তৃতীয় আর একটা জগতের অস্তিত্ব মানুষ টের পাবে। এভাবে প্রকৃতি একটার পর একটা জগত সৃষ্টি করে আমাদের কাছে সবসময় রহস্যময় হয়ে থাকবে। এটাই প্রকৃতির সবচেয়ে বড় ক্ষমতা, প্রকৃতি নিজেকে রহস্যে ঢেকে রাখতে পছন্দ করে। আর মানুষ চেষ্টা করে সেই রহস্যের বেড়াজাল ভেদ করে। এই প্রচেষ্টাই মানুষকে বেঁচে থাকার শক্তি জোগায় এবং মানুষ বেঁচে থাকে - হয়তো এটাই জীবন।

১৯

করিম চাচাকে সবাই চাচা বলে। অনিকও চাচা বলে। গাড়িতে উঠে বিদেয় নেয়ার সময় অনিক হাত নেড়ে নেড়ে বলল, আসি করিম চাচা।

করিম চাচা মুখে কিছু বলল না, তবে হাত নেড়ে নিজেও সবাইকে বিদেয় দিল।

গাড়ি গলির রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠতে অনিক নাজমুল হাসানকে উদ্দেশ করে বলল, বাবা, করিম চাচা কী বলেছে জানো?

কী বলেছে?

বলেছে তার নাকি পৃথিবী ছাড়াও আর একটা জগত আছে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, জগতটার নাম কী জানো?

না জানি না।

জগতটার নাম দ্বিতীয় জগত। ঐ জগতে সে নাকি মাঝে মাঝে যায় এবং সেখানে গেলে সে অনেককিছু জানতে পারে যা আমাদের এই জগত অর্থাৎ পৃথিবীতে থেকে জানা যায় না।

কী বলছ তুমি! এটা কী সত্যি?

আমার নিজেরও বিশ্বাস হয়নি। এজন্য সত্য কিনা তা বের করতে তাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম, আমার বাবার মোবাইল ফোন হারিয়ে গিয়েছে। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফোনটি কোথায় আছে?

তো করিম চাচা কী বলল?

চাচা তখন চোখ বন্ধ করে দ্বিতীয় জগতে চলে গেল। একটু পর চোখ খুলে বলল, আমাদের বাসায় যে ধূসর সোফা আছে মোবাইল ফোনটা ঐ সোফার দুটো কুশনের মাঝখানে পড়ে আছে।

নাজমুল হাসান এবার চোখ কুঁচকে বললেন, আমাদের বাসায় যে ধূসর রঙের সোফা আছে সেটা সে জানল কীভাবে? নিশ্চয় তুমি তাকে বলেছ?

না আমি বলিনি। দ্বিতীয় জগতের মাধ্যমে সে নাকি আমাদের বাসায় গিয়েছিল। তারপর মোবাইল ফোনটা কোথায় আছে সেটা দেখে এসে বলেছে।

নাজমুল হাসান এবং শিখা রহমান দুজনেই খুব বিস্মিত হলেন। তবে কেন যেন তারা এই প্রসঙ্গে আর কথা বললেন না। বাসায় ফিরে তারা যখন সত্যি দেখলেন মোবাইল ফোনটি ধূসর রঙের সোফার দুই কুশনের মাঝে পড়ে আছে তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকল না। দুজনেই স্বীকার

করতে বাধ্য হলেন, প্রকৃতি এতটাই রহস্যময় যে প্রকৃতির সকল রহস্য মানুষ কখনোই ভেদ করতে পারবে না। পৃথিবীর শুরুতে যেমন প্রকৃতি রহস্যময় ছিল, পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত প্রকৃতি রহস্যময়ই থাকবে।

রচনাকাল

ব্রডওয়ে হোটেল, সিঙ্গাপুর ০৪.১২.২০১৩ - ০৫.০১.২০১৪, হোটেল কায়রো ইন, মিশর

মোশতাক আহমেদ

জন্ম ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৫, জেলা ফরিদপুর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট থেকে এম ফার্ম ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ এবং ইংল্যান্ডের লেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে ক্রিমিনলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন চাকরিজীবী। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক।
তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে ,

সায়েন্স ফিকশন : *গামা, অমর মানব, প্রজেক্ট ইক্টোপাস, লালমানব, রোবটিজম, লাল শৈবাল, নিলির ভালোবাসা, নিঃসঙ্গ জিরি, দ্বিতীয় পৃথিবী, গিটো, প্রজেক্ট হাইপার, নিকি, নিরি, রিরি, লাল গ্রহের লাল প্রাণী, বায়োবোট নিওক্স, গিপিলিয়া, গিগো, ক্রিকি, সবুজ মানব, অণুমানব, রোবটের পৃথিবী, নিহির ভালোবাসা, ক্রি, রোবো, পাইথিন, ক্লিটি ভাইরাস, লিলিপুটের গ্রহে ।*
সায়েন্স ফিকশন রিবিট সিরিজ : *রিবিট, রিবিট ও কালো মানুষ, রিবিট এবং ওরা, রিবিটের দুঃখ, শান্তিতে রিবিট, রিবিটের জীবন, হিমালয়ে রিবিট, রিবিট ও এলিয়েন নিনিটি, রিবিট ও দুলাল, এক ব্যাগ রিবিট।*
প্যারাসাইকোলজি : *স্বপ্নস্বর্গ, ছায়াস্বর্গ, মন ভাঙা পরি, নীল জোছনার জীবন, বৃষ্টি ভেজা জোছনা, জোছনা রাতের জোনাকি, মায়াবী জোছনার বসন্তে।*
শিশিলিন কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ : *ডাইনোসরের ডিম, লাল গ্যাং, জমিদারের গুপ্তধন, হারানো মুকুট, কালু ডাকাত, কঙ্কাল ঘর, লালু চোর, ডলার গ্যাং, খুলি বাবা, কানাদস্যু।*
সামাজিক ও মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস : *নক্ষত্রের রাজারবাগ, জকি, লাল ডায়েরি, শিকার।*
ভ্রমণ উপন্যাস ঃ *বসন্ত বর্ষার দিগন্ত*
কিশোর উপন্যাস : *ববির ভ্রমণ, মুক্তিযোদ্ধা রতন ।*
ভৌতিক উপন্যাস : *রক্তনেশা, রক্তসাধনা, প্রতিশোধের আত্মা, ইলু পিশাচ, অশুভ আত্মা, আত্মা, কালা পিশাচ, অভিশপ্ত আত্মা, উলু পিশাচের আত্মা, শয়তান সাধক চিলিকের আত্মা, রক্ত পিপাসা, রক্তৃতৃষ্ণা, প্রেতাত্মা, অতৃপ্ত আত্মা।*
লো অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ : *লো, নরেন্দ্র জমিদারের যুগে, জংলীর দেশে, রাক্ষসের দ্বীপে, দূর গ্রহের নিগি, রোবটের যুগে।*
পুরস্কার : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পদক ২০১৮, শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৮, কালি ও কলম সাহিত্য পুরস্কার ২০১২, চ্যানেল আই সিটি আনন্দ আলো সাহিত্য পুরস্কার-২০১৫, ছোটোদের মেলা সাহিত্য পুরস্কার-২০১৪।
www.facebook.com/mostaque.ahamed.5

বইয়ের প্রাপ্তি ঃ booklightbd.com (Cell – 01787748888), www.rokomari.com